ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অতিদরিদ্র সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড

স্বকর্মে স্বয়ম্ভরা

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অতিদরিদ্র সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড

স্বকর্মে স্বপ্নধারা

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"ইউপিপি- উজ্জীবিত প্রকল্পের অতিদরিদ্র সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড-স্বকর্মে স্বপ্নধারা"

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০১৯

উপদেশক

মোঃ আবদুল করিম
গোলাম তৌহিদ
একিউএম গোলাম মাওলা

সম্পাদনা

ড. একেএম নুরুজ্জামান
মোঃ আশরাফুল হক
মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া
আহমেদ মাহমুদুর রহমান খাঁন

সংকলন ও ফটোগ্রাফি

ডা. ফয়জুল তারিক চৌধুরী

প্রকাশক

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ।
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ৮১৮১৬৬৪-৬৮
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮
ইমেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: pksf-bd.org

ডিজাইন ও মুদ্রণ

নেটপার্ক

অর্থায়নে- ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন

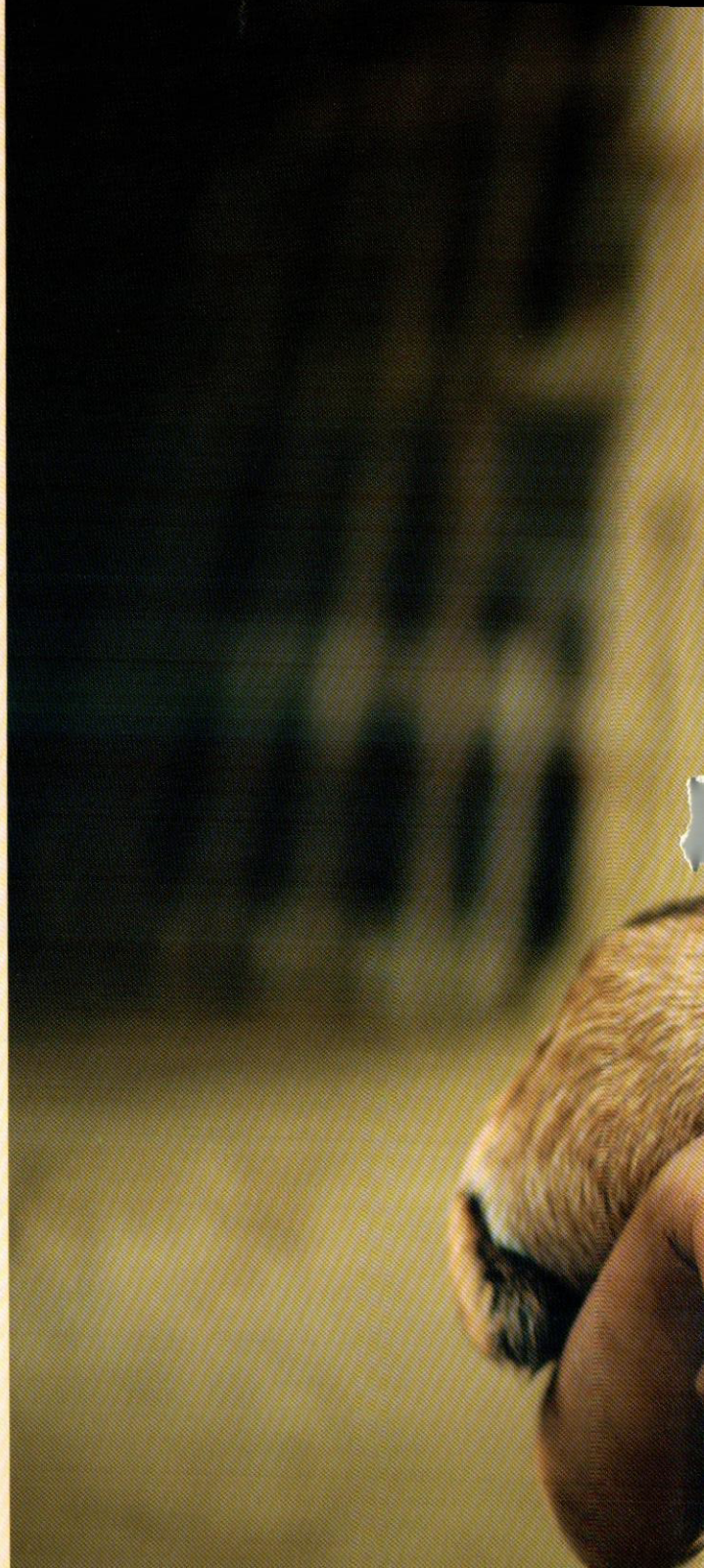

প্রাসঙ্গিকতা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর আর্থিক সহযোগীতায় "Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito" প্রকল্পভুক্ত ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা। এ লক্ষ্য অর্জনে লক্ষ্যভুক্ত খানাসমূহের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা হচ্ছে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কার্যক্রম রাজশাহী, বরিশাল ও খুলনা বিভাগের সকল ইউনিয়ন এবং লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী সকল ইউনিয়ন অর্থাৎ সর্বমোট ১,৭২৪টি ইউনিয়নের মোট ৩.২৫ লক্ষ ইউপিপি ও আরআরএমপি-২ সদস্যদের নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পিকেএসএফ নির্বাচিত ৩৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অতিদরিদ্র সদস্যদের দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনটি ফলাফল প্রাপ্তির আশা করা হচ্ছে, ফলাফলগুলি হলোঃ অতিদরিদ্র পরিবারের জীবন-মানের শোভন মান নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ও শারীরিক সক্ষমতা নিশ্চিতকরণ এবং সংগঠিত চরম অতিদরিদ্র পরিবারগুলির ক্ষমতায়ন এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ সদস্যকে কৃষিজ এবং ১৫ হাজার সদস্যকে অকৃষিজ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অধিকতর দরিদ্র সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন খাতে অনুদান (যেমন মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন, দোতলা পদ্ধতিতে মুরগি পালন, আদর্শ উজ্জীবিত বাড়ি, ক্ষুদ্র ব্যবসা) প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের এ সকল কার্যক্রমে সদস্যরা আয়বৃদ্ধিমূলক উপযুক্ত প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি এর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রকল্পের মধ্যবর্তী অভিঘাত মূল্যায়নে দেখা যায়, প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মাসিক আয় ৬,২৬০ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৫৯৫ টাকা হয়েছে। এই পুস্তিকাতে প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের সফল আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাফল্যগাঁথা সন্নিবেশ করা হয়েছে। এসব সাফল্যগাঁথা অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থসামাজিক উন্নতির ধারাবাহিকতা বর্ণনার পাশাপাশি তাদের চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। এই পুস্তিকার কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ভিন্নতা, অতি দারিদ্র্যের বিভিন্ন অবস্থা, গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বিবেচনা করা হয়েছে।

পিএমইউ, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ

Disclaimer:

"ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের অতিদরিদ্র সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড-স্বকর্মে স্বপ্নধারা" বিষয়ক এই পুস্তিকাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এবং প্রকাশিত। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য ও মতামতের সম্পূর্ণ দায়ভার পিকেএসএফ বহন করে। কোন পরিস্থিতিতেই প্রকাশনাটিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আমেনা: প্রান্তিক নয়, এখন প্রান্তজনের!	০৭
২	পাশে উজ্জীবিত, আত্মবিশ্বাসে বিজয় রচিত	০৯
৩	প্রশিক্ষণে পরিবর্তন!	১১
৪	বিধবা ঝুমারাণী: খয়রাতি নয়, স্বকর্মে জীবনে জয়	১৩
৫	হাতিয়ার রোকসানা, অভাব জয়ে তাঁর এখন সুদিন	১৫
৬	নুরনাহার: এখন ছাগলে পালনে স্বনির্ভর	১৭
৭	বরগুনার জাহানুর, মুরগী পালনে অভাব দূর	১৯
৮	মুরগি পালনে সফলতা: পরিবর্তন নয়, যেন রূপকথা	২১
৯	গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণে রোকেয়ার সুদিন	২৩
১০	রহিমা: হাঁস পালন করে ভাগ্য পরিবর্তন	২৫
১১	উজ্জীবিত নার্সারী অনুদানে, জীবন বদলায় তাঁর দিনে দিনে	২৭
১২	সূঁই সূতায় জীবন, নূরবানুর উত্তরণ	২৯
১৩	সবুজ সাথি রিনা বেগম, কেঁচো সার উৎপাদনে স্বাবলম্বী এখন	৩১
১৪	একজোড়া ছাগল আর স্বপ্ন ধারায়, সায়াহ্নে তার অভাব তাড়ায়	৩৩
১৫	সেলাই প্রশিক্ষণ, পাল্টে দেয় জীবন	৩৫
১৬	বারমাস হয় দুঃখ দূরীভূত, কবুতর খামার করে উজ্জীবিত	৩৭
১৭	খাদিজা বেগম: মাটি কাটার দিন শেষ, ছাগল পালনে সুদিনের উন্মেষ	৩৯
১৮	স্বকর্মে পার্বতী, দৃষ্টান্তমূলক উন্নতি	৪১
১৯	বাঁশ বেতে স্বপ্ন বুনন, সহায়ক তাঁর প্রশিক্ষণ	৪৩
২০	কালো মানিকে অভাব মোচন, আয়েশা সবার অনুকরণ	৪৫
২১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারে উজ্জীবিত হাওয়া, মালতী রাণীর বদলে যাওয়া	৪৭
২২	প্রতিবন্ধী পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সুখ অপার	৪৯
২৩	রিজিয়া: একটি সূর্যোদয়ের গল্প	৫১
২৪	চিরকুট	৫২

আমেনা: প্রান্তিক নয়, এখন প্রান্তজনের!

আমেনা বেগম, স্বামী: আবদুর রহিম, কালিরচর, লক্ষীপুর

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক এলাকায় ১ কামরা বিশিষ্ট ঘরে বসবাস
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:
আমেনা বেগম লক্ষীপুর জেলার কালিরচরে বসবাস করেন। স্বামীসহ ৩ ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। অন্যের জমিতে কামলা খেটে সংসার চলতো আমেনাদের। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া ৩ শতাংশ ভিটেমাটিতে ১ কামরার খুপড়িতে কোন রকমে তাঁরা বসবাস করতেন। আবদুর রহিমের দিনান্ত পরিশ্রমের অপর্যাপ্ত আয়ে সংসারের চাকা ঘোরানোর অসম চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তাদের মনে উদিত হতো না। সময়গুলো ছিল বিভীষিকাময় যাতনার আর কামনার শুন্যতায় রিক্ত। তারপরও পর্ণকুটিরের বেড়ার ফাঁকে আলোর উঁকিঝুকির মতো আমেনার মনে মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলে যায় সুদিনের স্বপ্ন। স্বপ্নের হাতছানিতে আমেনা ২০১৪ সালে উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য হন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে কিছু করতে পারা ছিল তাদের জন্য পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার মতো দুরূহ। তারপরও তিনি সমিতিতে নিয়মিত আসতেন। আমেনা বলেন, **'পরকল্পের ছারগো কাছতন মাইনষের উন্নয়নের লাই বেকগুন কতা আঁরে স্বপ্ন ফলানের আলো দেহাইত।'** আমেনার পারিবারিক দুরবস্থা ও উজ্জীবিত সমিতির প্রতি আন্তরিকতার কথা বিবেচনা করে ২০১৫ সালে সমিতির সকল সদস্যর সম্মতিতে তাঁকে বছরব্যাপী সবজি চাষের জন্য ৮,০০০/- টাকা অনুদান দেয়া হয়। আমেনা কালিরচরে ৪ বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে তাঁর স্বামীকে নিয়ে মৌসুমী সবজির আবাদ শুরু করেন। আমেনার দিন বদলের গল্প শুরু এখান থেকেই। আমেনা এখন ২০,০০০/- টাকার ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেন। ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য মাসিক ১০০/- টাকা হারে সঞ্চয় জমা করছেন। ৮ বিঘা জমিতে তিনি এখন চাষাবাদ করেন। ২টি গাভীও ক্রয় করেছেন সবজি ব্যবসায় লাভের টাকা দিয়ে। তাঁর ঘরে এখন ৩টি কামড়া আর বাড়ির চারপাশ ফলমূল আর সবজির বাগানে সুশোভিত। আমেনা বেগমের বাড়ির শাকসবজি অনেক দরিদ্র পরিবারের পুষ্টির যোগান দেয়।

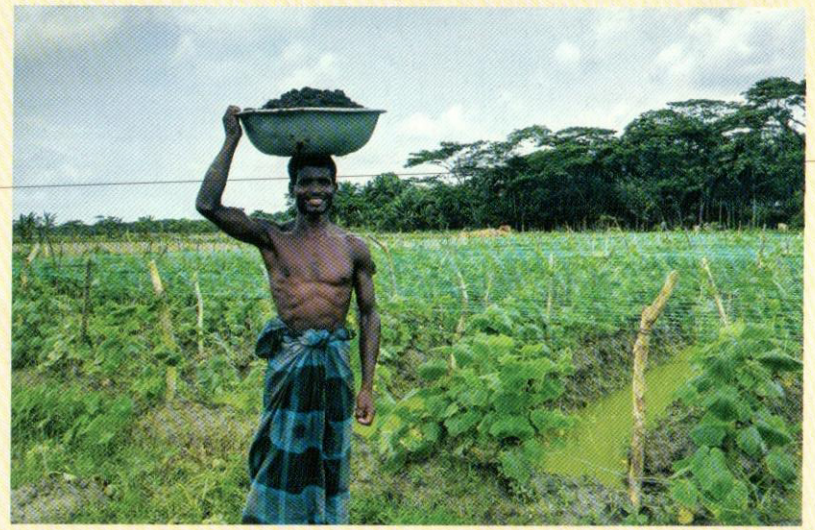

পাশে উজ্জীবিত, আত্মবিশ্বাসে বিজয় রচিত

আকলিমা বেগম, স্বামী: মোঃ ছোটন, বাগাতিপাড়া, নাটোর

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: ভাড়ায় ভ্যান চালিয়ে সংসার চলে
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: ভ্যান চালক
পরিবারের আকার: ৬ জন
মাসিক আয়: ৫,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:
ছোটবেলায় মাকে হারানো আকলিমা ১৫ বছর বয়সে দিনমজুর মোঃ আব্দুল আজিজের সাথে সংসারধর্ম শুরু করেন। পরবর্তীতে সংসার বড় হওয়ার সাথে সাথে খরচ বেড়ে যাওয়ায় আকলিমাকে পরের বাড়িতে কাজ করতে হতো। খন্ডকালীন দিনমজুরী আর পরের বাড়িতে কাজের আয় দিয়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট আকলিমার সংসারটি খুবই কষ্টে চলতো। আকলিমা বলেন, **'আজিকার দিনের পরে কালিকে কোন খাওয়ার হোবি কিনা সে নিশ্চিত ছিল না। স্বামীর কম আয়ে সে সময় সংসার চালান কঠিন ছিলি।'** উজ্জীবিত প্রকল্পে ২০১৪ সালে অন্তর্ভুক্তির পর ৭,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আকলিমা ২টি (দুই) কালো জাতের মা ছাগল ক্রয় করেন। এছাড়াও উজ্জীবিত প্রকল্প হতে আকলিমা মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ পান। আকলিমার আর্থিক দুরবস্থা প্রশমনের জন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রকল্প হতে তাঁকে ২টি মা ছাগল ও ছাগল পালনের জন্য মাচা ঘর অনুদান হিসাবে দেয়া হয়। আকলিমা বলেন, **'আমি খোয়াব দেখতাম এই অশান্তির আনধার একদিন শেষ হোবি।'** কিন্তু এর যবনিকাপাত করতে উজ্জীবিত প্রকল্পই যে আর্শিবাদ হয়ে আসবে তা তিনি কিছুদিন পর বুঝতে শুরু করলেন। প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার টেকনিক্যাল এর নিয়মিত পরামর্শ ও সহযোগিতায় আকলিমা তাঁর ছাগলগুলোকে নিয়মিত টিকা প্রদান এবং কৃমির বড়ি খাওয়াতেন। ২০১৬ সালে আকলিমা ৮ টি ছাগল বিক্রি করে তার স্বামীকে একটি ভ্যান ক্রয় করে দেন। ভ্যান চালিয়ে তাঁর স্বামী দৈনিক ৩০০-৪০০/- টাকা আয় করেন। বর্তমানে আকলিমার মা ছাগলের সংখ্যা ০৬টি। আকলিমা বর্তমানে ২০,০০০/- টাকা ঋণের কিস্তি চালান এবং সাপ্তাহিক ৫০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করেন। তাঁর ২জন সন্তান স্কুলে পড়ালেখা করছে। স্বামী সন্তান নিয়ে আকলিমা তার কুটিরে এখন সুখের দিনের সোনালী স্বপ্নের জাল বুনেন।

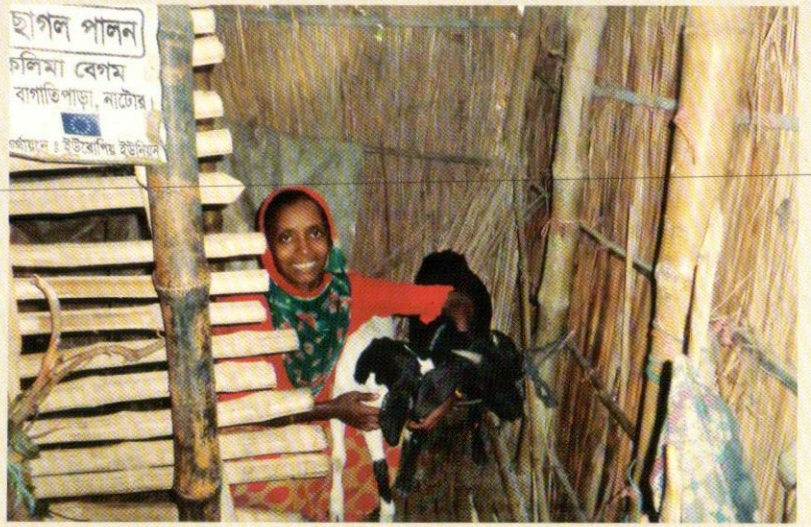

প্রশিক্ষণে পরিবর্তন!

মিনারা বেগম, স্বামী: ফরিদ উদ্দিন, ভবানীগঞ্জ, লক্ষীপুর

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাস
জমির পরিমাণ: ৪ শতাংশ
আয়ের উৎস: কৃষিকাজ
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:
অতিদরিদ্র সদস্য হিসাবে মিনারা ২০১৪ সালে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে বাঁশ ও বেত সামগ্রী তৈরিকরণের প্রশিক্ষণ পান। এরপর হতে দিনান্ত পরিশ্রম করে সেই আয় দিয়ে স্থবির হয়ে যাওয়া সংসারের হালে বাতাস লাগানোর চেষ্টা করতে থাকেন। মিনারা বলেন, **'টেডিংএ যে কাম হিকছি আঁর এলাকাত হেই কামের দাম আছে। এইয়ার লাই আঁই মনে কইত্যাম আঁর কষ্ট একদিন স্বার্থক অনব।'** ঘরে বিবাহ উপযুক্ত মেয়ের বিয়ের টাকা যোগানোর জন্য মিনারা দিন রাত পরিশ্রম করেন। এর মধ্যে স্বামীকেও তিনি এই কাজ শিখিয়ে দেন।

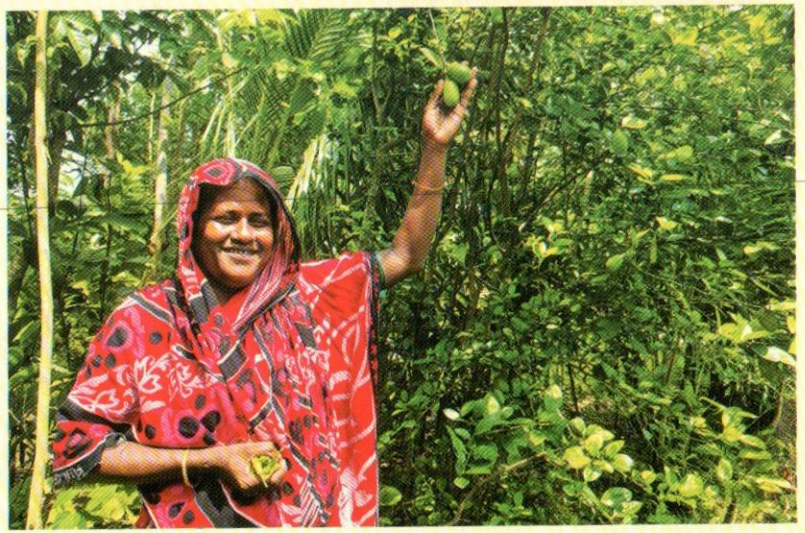

মাঠে কাজের ফাঁকে তাঁর স্বামী তাঁকে মোড়া, চাটাই, জায়নামাজ এসব তৈরিতে সাহায্য করেন। পরে জমানো টাকা আর ঋণ নিয়ে তাদের মেয়েকে পাত্রস্থ করেন মিনারা। মোড়া আর চাটাই বানানোর টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধও করেন। মিনারা বলেন, **'বিয়ার লায়েক মাইয়্যারে বয়স কালে বিয়া নো দিতাহালে আমগো সমাজে শরমের কতা। উজ্জীবিত পরকল্পের এই টেডিং আঁরে হেই শরমের আতেত্বন বাঁচাইছে।'** মিনারা এবং তাঁর স্বামী পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে স্কুলে যেতে না পারলেও মিনারা তাঁর ছেলেমেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। সমিতিতে সন্তানদের লেখাপড়া করানোর বিষয়ে প্রোগ্রাম অফিসার সোশ্যাল আলোচনা করেন যা তাঁর মনে ব্যাপক সাড়া দেয়। সেই সাড়ায় আশার বিন্দু বিন্দু সম্ভাবনায় চাটাইয়ে নকসা কেটে যান মিনারা। বর্তমানে তিনি সহযোগী সংস্থা হতে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তাঁর উদ্যোগে বিনিয়োগ করেছেন। মিনারা ভবিষ্যতের জন্য মাসিক ২০০/- টাকা হারে সঞ্চয় জমা করছেন। বাঁশ ও চাটাইয়ের বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান দিয়ে তিনি নিজেই এর উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

বিধবা ঝুমারাণী: খয়রাতি নয়, স্বকর্মে জীবনে জয়

ঝুমা রাণী, স্বামী: মৃত: দেবাশিষ, কোষ্ট ট্রাষ্ট, ভোলা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক এলাকায় ১ কামরা বিশিষ্ট ঘরে বসবাস
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিনমজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৫,৫০০/- টাকা

পুর্বাপর:
মেঘনার পাড়ে বসতি ঝুমার। ১০ বছর আগে ঝুমা রাণী বিধবা হন। ২টি সন্তান নিয়ে খয়রাতি করে জীবন পার করতেন তিনি। তাঁর পতির অন্তিম বাসনা ছিল মেয়েকে লেখাপড়া শিখানোর। নিজের সম্পতি যা ছিল তা বিক্রি করে করে তাঁর প্রতিবন্ধী বড় মেয়ে শিখা রাণীর লেখাপড়ার খরচ দেন। বাড়ি বাড়ি কাজ করে সংসারের খরচ চালাতেন তিনি। গ্রামের মেম্বার চাচা একদিন বললেন রাস্তার মাটি কাটার কাজ করলে নাম জমা দেয়ার জন্য। চারিদিকে শুধু অন্ধকারের হাতছানি; কাজ না করলে খাবে কি? আর মেয়েগুলোকে যে পড়ালেখা শিখাতেই হবে! তাই রাস্তায় মাটি কাটার কাজের জন্য নাম জমা দেয় ঝুমা। আর এভাবে কষ্টের ২টি বছর পার করেন। ২ বছর পর ২০১৫ সালে ঝুমা তাঁর সঞ্চয়ের ৩৬,০০০/- টাকা উজ্জীবিত প্রকল্পের আরইআরএমপি ২ কম্পোনেন্টের মাধ্যমে পান। ৪ মাসের গর্ভবতী ১টি গাভী কিনেন ঐ জমানো টাকা হতে। দিনান্ত পরিশ্রম করে ঝুমা মাঠ হতে গাভীর ঘাস পাতা জোগাড় করেন। কিছুদিন পর গাভীটি ১টি লাল বকনা বাছুর প্রসব করলে সেই গাভীর দুধ বিক্রি করে কোন রকমে চলতে থাকে সংসারের চাকা। সংসারের দৈনন্দিন খরচের পাশাপাশি সন্তানদের পড়ালেখার খরচ যোগাড় করা ঝুমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। সমিতির সকল সদস্যর সুপারিশে প্রকল্প হতে তাঁকে তিন তলা পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালনের জন্য অনুদান দেয়া হয় যা হতে প্রতিদিন কিছু আয়ের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবারও জোটে। ঝুমা বলেন, **'স্বামী ছাড়া সংসারে এই রহম ৩ বেলা খাওন ঝোটানো আমার পক্ষে সম্ভব হইতো না যদি প্রকল্প থেকে বিভিন্ন রহমের সহযোগিতা না পাইতাম।'** ঝুমার এখন ২টি গাভী, ১টি এঁড়ে বাছুর এবং ৪০টি দেশী মুরগি আছে। তাঁর বড় মেয়ে শিখা মনের প্রবল জোরে বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞান এ অনার্স পড়ছে আর ছোট মেয়েটা ২য় শ্রেণিতে পড়ছে। শিক্ষক হওয়ার প্রবল বাসনা নিয়ে শিখা পড়ালেখা করে যাচ্ছে।

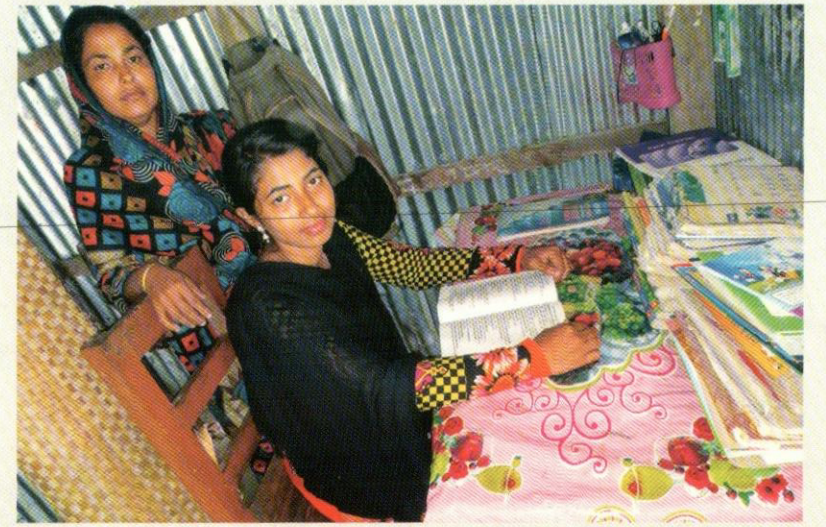

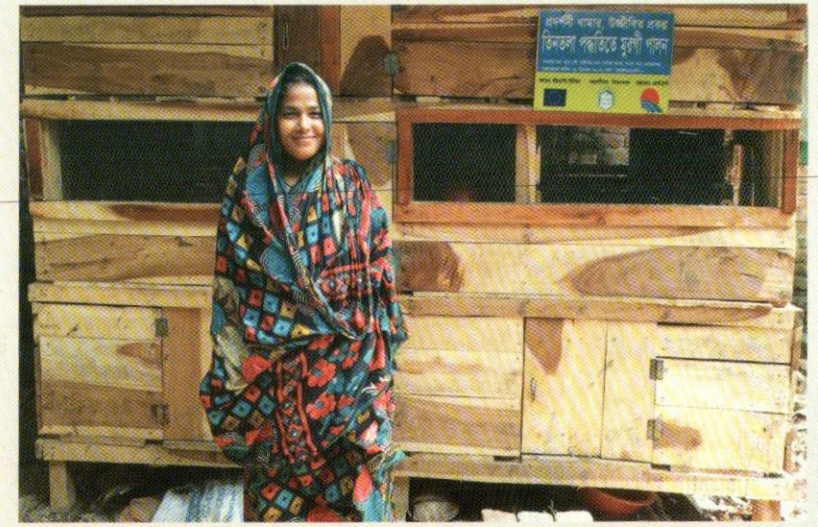

হাতিয়ার রোকসানা, অভাব জয়ে তাঁর এখন সুদিন

রোকসানা বেগম, স্বামী: মোঃ আলতাফ হোসেন, চরকিং, হাতিয়া

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাস
জমির পরিমাণ: ৪ শতাংশ
আয়ের উৎস: বর্গাচাষী
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

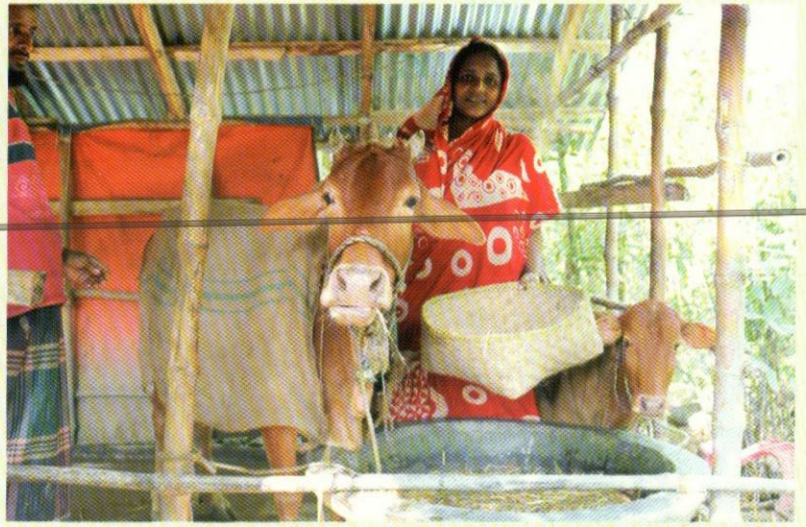

পূর্বাপর:

প্রমত্তা মেঘনা আর বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশির বুকে রোকসানা বেগমদের বেড়ে উঠা। প্রকৃতির ভাঙ্গা গড়ার খেলায় তাদের জীবনের চাকার ঘূর্ণন সমতালে চলে। হাতিয়া নিবাসী রোকসানা বেগম উজ্জীবিত প্রকল্পের একজন সদস্য। ৩ সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে ৫ জনের সংসার রোকসানার। রোকসানার স্বামী মোঃ আলতাফ হোসেন পরের জমিতে বর্গা খেটে সংসার চালান। ৪ বছর আগে ৩ গন্ডা জায়গায় নিজের বসত ভিটা ছাড়া কোন জায়গা জমি ছিল না তাদের। রোকসানার কথায় **'কাইলগা কোন খানা আঁর হোলা হাইন এর কফালে জুইটবে কিনা জাইনতাম না।'** এমনই অনিশ্চয়তার মাঝে সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছিল তাদের। সেখানে প্রোগ্রাম অফিসার টেকনিক্যালের সেশন শুনে তিনি ছাগল পালনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২টি ছাগল বর্গা নিয়ে পালন করতেন। পরবর্তীতে তার পারিবারিক অবস্থা ও আগ্রহের কথা বিবেচনা করে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জন্য মাচাসহ ২টি ছাগল অনুদান হিসাবে দেয়া হয়। রোকসানা বলেন, **'এই ছাগল হালি আঁর অভাব দূর হইছে।'** সহযোগী সংস্থা হতে তিনি ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে আরো ২টি মা ছাগল ক্রয় করে পালন করতেন। ২ বছরের মাথায় তিনি ৮টি ছাগল বিক্রি করে একটি গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে রোকসানার বাছুরসহ ২টি গাভী এবং ৬টি ছাগল আছে। তিনি গাভীর দুধ বিক্রির টাকায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেন। রোকসানার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য মাসিক ৫০০/- টাকা হারে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছেন। ভবিষ্যতে একটি গাভীর খামার করে তিনি নিজেই উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

নুরনাহারঃ এখন ছাগলে পালনে স্বনির্ভর

নুরনাহার বেগম, স্বামীঃ মোঃ ইব্রাহিম, বেনাপোল, যশোর

প্রাক্ জীবনচিত্রঃ
অতি দারিদ্র্যতার ধরনঃ সরকারি খাস জমিতে ১ কামরাবিশিষ্ট ঘরে বসবাস
জমির পরিমাণঃ নাই
আয়ের উৎসঃ দিন মজুর
পরিবারের আকারঃ ৪ জন
মাসিক আয়ঃ ৪,০০০/- টাকা

পূর্বাপরঃ

ছেলে, মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে নুরনাহার অন্যের জায়গায় রাস্তার পাশে ঝুপরি ঘরে বসবাস করতো। বর্ষায় তাদের বাড়ি পানিতে তলিয়ে যায়, পলিথিন দিয়ে চাল ঢেকে কোন রকমে ঘুমাতো তারা। পরের জমিতে কামলা দিত তার স্বামী ইব্রাহিম। ২০১৪ সালে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় তিনি বেনাপোল শাখা হতে ৩,০০০/- টাকা বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে ১০টি হাঁস ক্রয় করেন। হাঁস পালনের পাশাপাশি একটি ছাগল পুশানি (বর্গা) নিয়ে পালন করতেন নুরনাহার। চাতালের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নুরনাহার হাঁস ও ছাগল পালন করতেন। ভোরে বিল থেকে শামুক কুড়ানো ও ঘাসকাটা, দিনের বেলা শ্রম বিক্রি করা; আর রাতে হাঁসের শামুক খাওয়ানো, গরুর খড় কাটা, বাজার থেকে ভুসি আনা ইত্যাদি কাজগুলো দুই জন মিলে করতেন। নুরনাহারের বর্গা নেয়া ছাগলটি ব্লাক বেঙ্গল জাতের হওয়ায় প্রতিবার ৪টি করে বাচ্চা দিত। প্রকল্পের সদস্য হওয়ায় প্রোগ্রাম অফিসার টেকনিক্যালের কাছ থেকে গবাদি প্রাণি পালনের জন্য নিয়মিত কারিগরি সেবা ও পরামর্শ নেয়া হতো। নুরনাহার ২য় দফায় ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ছাগল বিক্রির টাকাসহ একটি ষাঁড় গরু ক্রয় করে মোটাতাজা করতে থাকেন। ২০১৬ সালে নুরনাহার ১২ টি ছাগল ও ষাঁড় বিক্রয় করে ঐ গ্রামে রাস্তার পাশে ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেছে। নুরনাহার বলেন, **'নিজের মাটিতে ঘর বাইন্ধে থাকার যে কি আনন্দ তা মুখে প্রকাশ কত্তি পাত্তিছিনে। পরজেক্টের স্যারগের সহযোগিতা আর তাগের যুক্তি আমারে শক্তি দেছে।'** বর্তমানে নুরনাহারের মাচাসহ ৩২ টি ছাগল ও দুইটি গরুসহ একটি গোয়াল ঘর আছে। এছাড়াও তিনি দোতালা পদ্ধতিতে মুরগি ও হাঁসপালন করেন। এখন আর নুরনাহারকে পরের চাতালে কাজ করতে যেতে হয় না, তার স্বামীকে ওপরের জমিতে কামলা দিতে হয় না। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ নিয়ে তারা আর দুশ্চিন্তা করেন না। সংসারে অভাব না থাকায় নুরনাহারের চোখে মুখে হতাশার পরিবর্তে আনন্দের ছাপ লেগেই থাকে।

বরগুনার জাহানুর, মুরগী পালনে অভাব দূর

জাহানুর বেগম, স্বামী: সুলতান মিয়া, বেতাগী, বরগুনা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাস
জমির পরিমাণ: ৪ শতাংশ
আয়ের উৎস: বর্গাচাষী
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,৫০০/- টাকা

পূর্বাপর:
বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার করুনা গ্রামের সুলতান মিয়ার স্ত্রী জাহানুর বেগম। এক মেয়ে ও দুই ছেলে সহ পাঁচ জনের সংসার। সুলতান মিয়া বর্গা জমিতে চাষ করে যে ফসল পেতেন তাতে ৫ জনের সংসার চালানো খুবই কষ্টকর ছিল। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে জাহানুর বেগম ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০/- টাকা বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে একটি মুরগির ঘর ও ৩০টি দেশী মুরগি ক্রয় করে তা পালন করা শুরু করেন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে দোতলা পদ্ধতিতে মুরগি পালনের ওপর ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জাহানুর বলেন, **'প্রশিক্ষণ পাইয়া মুই খুবই উপকার পাইছি। কারন এহানে দুইতালা খোপে মুরগি পালার যে নিয়ম হিগছি, হ্যাতে আগের চাইতে এ্যাহোন মোর দুইগুন লাভ অইতে আছে। আর এ্যাতে কষ্ট কম, কারন একচোডে ব্যাবাক মুরগি দেহাশুনা করা যায়।'** জাহানুর বেগম পুনরায় ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তা থেকে ৫,০০০/- টাকায় দুইটি ছাগল ক্রয় করে ও বাকী ৫,০০০/- টাকা দিয়ে একটি দোতলা মুরগির ঘর তৈরী করে। স্থানীয় পদ্ধতিতে দেশী মুরগি থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে প্রথম দফায় ২০টি বাচ্চা মুরগি দোতলা মুরগির ঘরে পালন করে। ২-২.৫ মাস পালন করে প্রতিটি মুরগি গড়ে ৩০০-৩৫০/- টাকা দরে বিক্রি করে ৪,০০০/- টাকা লাভ করেন। দ্বিতীয় দফায় ৬০টি বাচ্চা মুরগি পালন করে ৩ মাসে প্রায় ১০,০০০/- টাকা লাভ করেন। মুরগি পালনের পাশাপাশি জাহানুর বেগম হাঁসও পালন করেন। বর্তমানে তার ৩০টি হাঁস রয়েছে যা থেকে তিনি গড়ে প্রতিদিন ২০টি ডিম পান। বর্তমানে জাহানুর বেগমের মুরগির খোপে ২০টি ডিমপাড়া মুরগি, ৫৫টি বাচ্চা মুরগী ও ৩৫টি বিক্রয়যোগ্য ডেকি মুরগি রয়েছে। জাহানুর বেগমের এ সফলতা দেখে আগ্রহী হয়ে একই গ্রামের অনেকেই স্ব-উদ্যোগে দোতলা পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন করছেন।

মুরগি পালনে সফলতা: পরিবর্তন নয়, যেন রূপকথা

নুরজাহান বেগম, স্বামী: মোঃ আক্কাস আলী, চাটমোহর,পাবনা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: নারী প্রধান পরিবার
জমির পরিমাণ: ৪ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৪ জন
মাসিক আয়: ৫,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:

অতিদরিদ্র পরিবার হিসাবে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প হতে নুরজাহান বেগমকে ২৩ আগষ্ট ২০১৪ সালে লেয়ার মুরগি প্রদর্শনী খামারের জন্য ২০,০০০/- টাকা অনুদান দেয়া হয়। তিনি ৩৫০টি সোনালী জাতের বাচ্চা দিয়ে তাঁর খামারের কাজ শুরু করেন। সন্তানদের মানুষ করার দৃঢ় প্রত্যয় আর দারিদ্র্যতা হতে কলঙ্কমুক্ত জীবনের পিপাসায় নুরজাহান এই খামারকেই তার একমাত্র ইবাদত হিসাবে এর উপাসনা করতে শুরু করে। খামারে দিনান্ত মেহনতে তাঁকে প্রেরণা ও সহযোগীতা করেছে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের কারিগরি লোকবল ও সর্বোপরি তাঁর স্বামী, পুত্র আর কন্যা।

৩৫০টি বাচ্চা দিয়ে শুরু করা তাঁর খামারে এখন ১৫০০টি ডিমপাড়া মুরগি রয়েছে। আগের সেই ছোট্ট খুপরী ঘরে তিনি মুরগি পালন করেন না। খামার হতে লাভের টাকা দিয়ে তিনি ২৮ হাত বাই ১০ হাত মাপের মুরগি পালনের ২টি সেড নির্মাণ করেছেন এবং ২ব্যাচ মুরগি সেখানে পালন করছেন। নুরজাহান বলেন, **'এই মুরগি খামারডার লাভের ট্যাকায় বিটির বিয়ে দিছি। উজ্জীবিত প্রকল্প থ্যাকে যদি এই খামারডা করে না দিতো তালিপারি বিটির লেহাপড়া শিখে ভাল বাড়িত বিয়ে দিবের পারলাম নানি।'** -কথাগুলো বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দ অশ্রু বের হচ্ছিল। বর্তমানে নুরজাহান ১ লক্ষ টাকার কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেন। এছাড়াও তিনি সাপ্তাহিক নিয়মিত ১০০/- টাকা করে সঞ্চয় জমা করেন। তিনি চাটমোহরে মুরগি পালনের একজন সফল নারী উদ্যোক্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত।

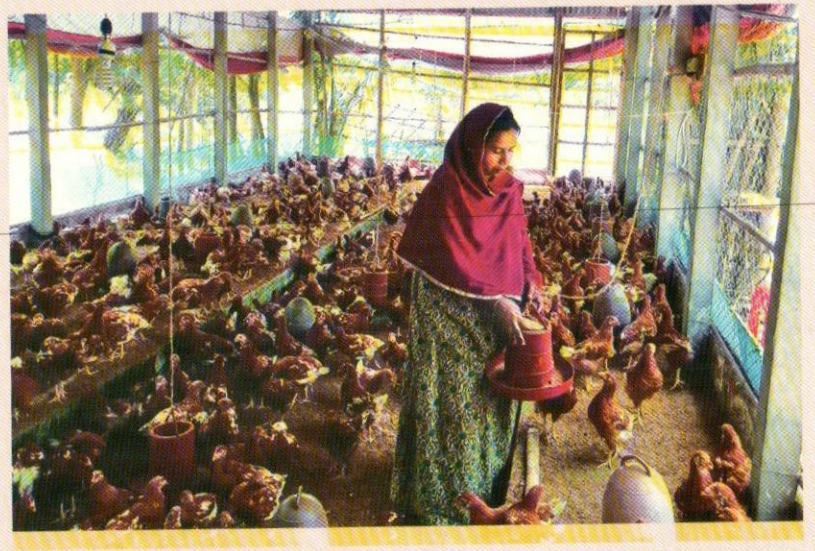

গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণে রোকেয়ার সুদিন

রোকেয়া বেগম, স্বামী: মোঃ আফসার, বাগাতিপাড়া, নাটোর

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: বর্গাচাষী
জমির পরিমাণ: ৪ শতাংশ
আয়ের উৎস: পরের জমি চাষ ও দিনমজুরী
পরিবারের আকার: ৬ জন
মাসিক আয়: ৬,৫০০/- টাকা

পূর্বাপর:
স্বামীর দিনমজুরি আর পরের বাড়িতে কাজ করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট রোকেয়ার সংসার চলতো। উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অতি দরিদ্র রোকেয়াকে গরু মোটাতাজাকরণের ওপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তাঁর জমানো কিছু টাকাসহ মোট ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে ১টি ষাঁড় গরু ক্রয় করেন। সারা দিন কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে গরুটিকে যত্ন ও সঠিকভাবে খাবার দিয়ে মোটাতাজা করে ৪ মাসের মধ্যে ৫৫,০০০/- টাকায় বিক্রয় করেন। রোকেয়ার স্বামী গরু বিক্রির টাকা দিয়ে আরো ২টি ষাঁড় ক্রয় করেন, যা ৪ মাস পরে মোট ১,২০,০০০/- টাকায় বিক্রি করেন। রোকেয়া বলেন, **'উজ্জীবিত পোকল্প থ্যাকি গরুমুটাতাজাকরার বিষয়ে টেলিং এর পরে আমারে সংসারে ম্যালা উন্নতি হচে।'** এভাবে তাঁরা প্রশিক্ষণলব্ধ শিখন হতে বাস্তবে এর প্রতিফলনে পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করছেন। রোকেয়া বেগমের সংসারের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনের পাশাপাশি পেশারও পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে তিনি দিন মজুরীর কাজ করতেন এবং পরের বাড়ীতে কাজ করতেন। বর্তমানে গরু মোটাতাজাকরণের একজন সফল উদ্যোক্তা তিনি। ১ লক্ষ টাকা ঋণের নিয়মিত কিস্তি চালাতে তাঁর কোনো সমস্যা হয় না। ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার না করতে পারলে সংসারের অবনতি হয় বলে তিনি মনে করেন। পক্ষান্তরে এর সঠিক ব্যবহারে রয়েছে উন্নতির স্বাদ।

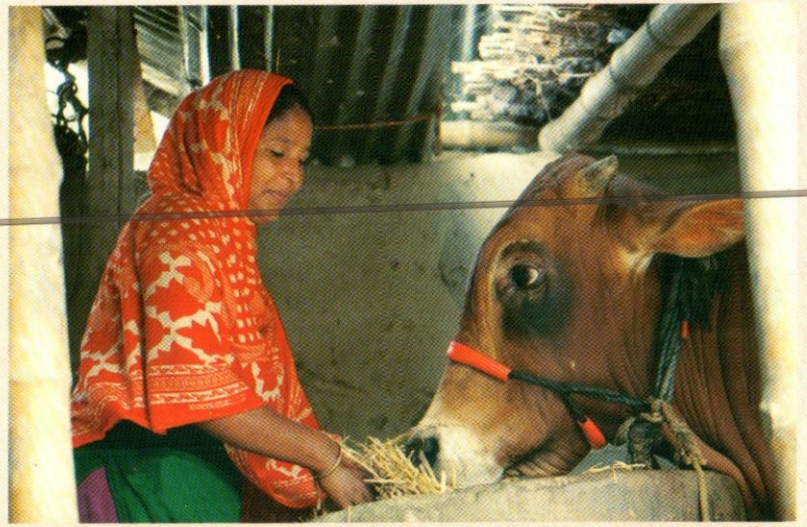

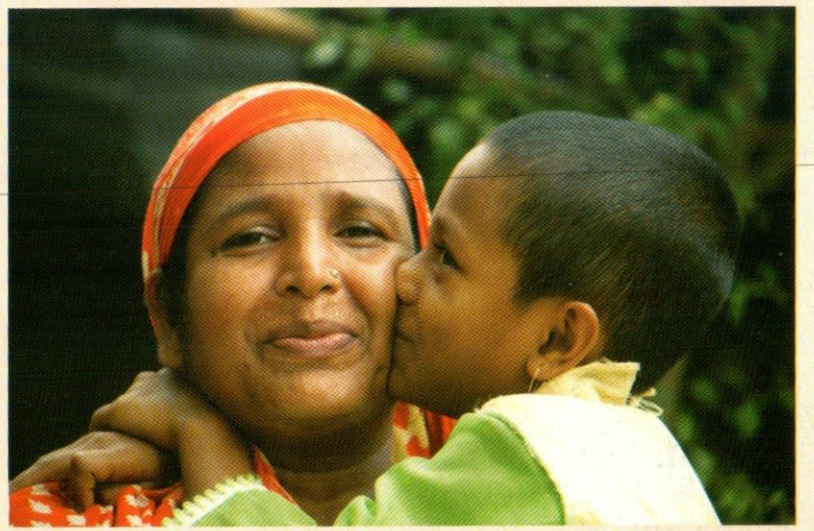

রহিমা: হাঁস পালন করে ভাগ্য পরিবর্তন

রহিমা বেগম, স্বামী: মোঃ শাহে আলম, লালমোহন, ভোলা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাস
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: মাছ ধরা
পরিবারের আকার: ৪ জন
মাসিক আয়: ৫,৫০০/- টাকা

পূর্বাপর:
তেতুলিয়া নদীর তীরবর্তী কচুয়াখালী গ্রামে স্বামী আর ৪ সন্তান নিয়ে শ্বশুড়ের রেখে যাওয়া ছোট দু-চালা টিনের খুপড়ীতে রহিমা বেগম বসবাস করতেন। তাঁর স্বামী শাহে আলম মাছ ধরে অত্যন্ত কষ্টে এই ৬ সদস্য বিশিষ্ট সংসারটি চালাতেন। উপকূলবর্তী হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে পারতেন না তিনি। এছাড়াও সরকারি বিধি নিষেধের কারণে বৎসরের কিছু সময় নদীতে মাছ ধরা বন্ধ থাকে। তাই সব মিলিয়ে শাহে আলমের আয় রোজকার ছিল খুবই অপ্রতুল। এরকম অতি দারিদ্র্যতার মধ্যে রহিমা বেগম উজ্জীবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির পর ১০,০০০/- টাকা বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে ৫০টি হাঁস কিনে পালন করতে থাকেন। সমিতির আলোচনায় হাঁস পালনের প্রশিক্ষণের কথা শুনে আগ্রহ প্রকাশ করেন রহিমা এবং সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ২য় দফায় ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ১০০টি হাঁস ক্রয় করেন। শাহে আলম পেশা পরিবর্তন করে হাঁস পালন শুরু করেন। দিনে দিনে খামারের আকার বাড়তে থাকে। এখন স্বামী শাহে আলমকে আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে যেতে হয় না। কালক্রমে তার খামারে হাঁসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০টিতে। হাঁস দেখাশুনা করার জন্য একজন শ্রমিকও নিয়োগ করেন তাঁরা। খামারের আয় দ্বারা ইতিমধ্যে তিনি দুই মেয়ের বিয়ে দেন। পাশাপাশি ১৫০ শতাংশ চাষাবাদের জমি ক্রয় করেন। হাঁসের বিষ্ঠা মাছের উৎকৃষ্ট খাবার তাই পুকুরে মাছ চাষের কথা চিন্তা করে তিনি ৬ শতাংশ পুকুর ক্রয় করেন। বর্তমানে তার পুকুরে রয়েছে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ। বর্তমানে তার ৩৫০টি হাঁস রয়েছে যার আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও পুকুরে রয়েছে প্রায় ২০ হাজার টাকার মাছ। রহিমা বলেন, **'হাঁস, ডিম এবং মাছ ব্যাচাতে এহন আমাদের বাড়িতে অনেক মানুজন দূরেগনে আয়। এহন আমাদের সবাই চেনে। এহন মানষে আমাদের দ্যাখলে মুখ ঘুরাইয়া লয় না। এইডা অনেক আনন্দের আর হম্মানের।'**

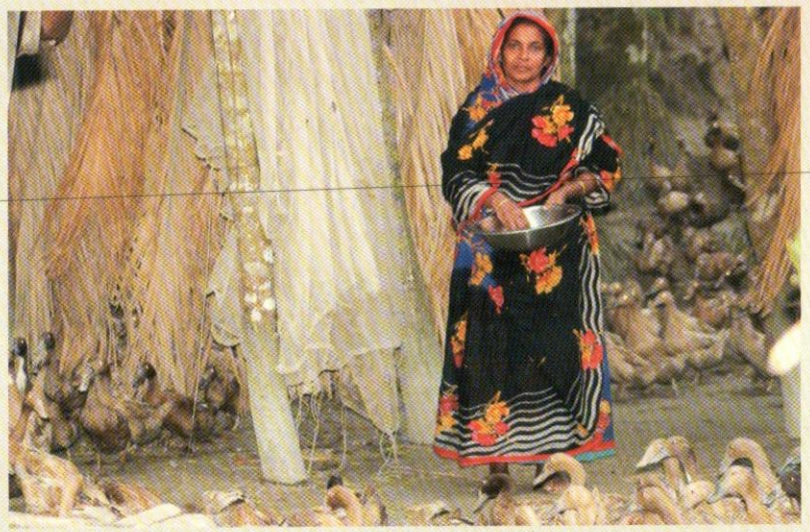

Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito P
UPP-Ujjibito Componenet

উজ্জীবিত নার্সারী অনুদানে, জীবন বদলায় তাঁর দিনে দিনে

বিবি কুলসুম, স্বামী: মোঃ জসীম উদ্দিন, থানারহাট, নোয়াখালি

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিবন্ধী পরিবার
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:
বিবি কুলসুম একজন অতিদরিদ্র বাকপ্রতিবন্ধী মহিলা। ৩ সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে তাদের সংসার। পারিবারিকভাবে তাঁদের বাড়ির পাশে একটি নার্সারী আছে। নার্সারীর চারা বিক্রির টাকায় সংসার চলে তাঁদের। পুঁজির অভাবে নার্সারীতে চারা কম থাকায় বেচাবিক্রি ভালো হতো না। তাই তাঁর স্বামীকে মাঝে মাঝে দিনমজুরীর কাজ করে সংসারের খরচ চালাতে হয়। পারিবারিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ২০১৫ সালে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে নার্সারীতে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বিবি কুলসুমকে অনুদান বাবদ ৮,০০০/- টাকা দেয়া হয়। এতে তাঁরা দুইজন নতুন উদ্যোমে নার্সারীতে চারা উৎপাদন শুরু করেন। চারা উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় নার্সারীর বেচাবিক্রি বেড়ে যায়। কুলসুম বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ায় ক্রেতাদের সাথে বেচাবিক্রি করতে পারেন না। তাই তাঁর স্বামী দিনমজুরীর কাজ ছেড়ে দিয়ে নার্সারীর কাজে পুরো সময় অতিবাহিত করেন। নার্সারীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নার্সারীর চারা বিক্রির জন্য যোগাযোগ করেন। নার্সারীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুলসুম ২৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে চারার সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নার্সারীর সীমানা বেড়া মেরামত করেন। চারা বিক্রির আয়ে ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে তিনি সঞ্চয় করেন। বর্তমানে কুলসুমের নার্সারীতে ১৫০,০০০/- টাকার বিভিন্ন জাতের চারা আছে। কুলসুমের স্বামী মোঃ জসীম উদ্দীন বলেন, **'আঁরে অন আর বদইল্যা আমাকে এখন আর দিনমজুরীর কাজ করতে হয় না। আমি আমার পরিবারকে যথেষ্ট সময় দিতে পারি এখন। সমাজের মানুষ আমাকে এখন সম্মানের চোখে দেখে।'**

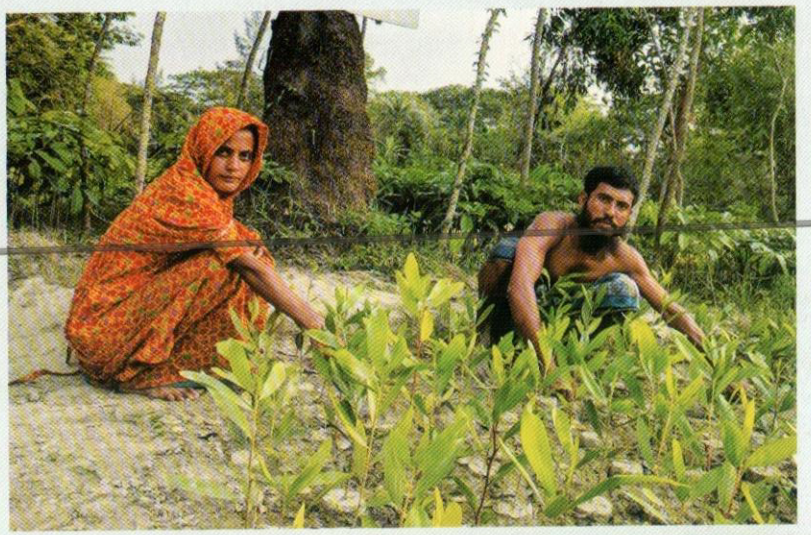

সূঁই সূতায় জীবন, নুরবানুর উত্তরণ

মোছা: নুরবানু বেগম, স্বামী: মোঃ লতিফ শাহ, মোহনপুর, রাজশাহী

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: দিনমজুরীর আয়ে সংসার চলে
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,৫০০/- টাকা

পূর্বাপর:
রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার মৌপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ নূরবানু বেগম। ৫ জনের সংসার তাঁর। নুরবানুর স্বামী ছিলো কৃষি দিনমজুর। নুরবানু বাড়ীতে গৃহিনীর কাজ করতো। পাশাপাশি তিনি সনাতন পদ্ধতিতে দেশি মুরগী পালন করতেন। পরিবারে আয় করার মানুষ ছিলো একজন আর খাওয়ার মানুষ পাঁচ জন। ফলে খুব কষ্ট করে তাদের সংসার চলতো। সংসারের খরচ চালানোর জন্য তার স্বামী লতিফ শাহ মাঝে মাঝে শহরে এসে দিনমজুরীর কাজ করতেন। অতিদরিদ্র পরিবার হিসাবে ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের আওতায় নুরবানু বেগমকে ২০১৫ সালে ১২ দিনব্যাপী কারচুপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্থানীয় একটি ফ্যাশন হাউজের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠান নিয়মিত কাজের অর্ডার দিয়ে সময়মতো মজুরি পরিশোধ করতো। এতে তাঁদের সংসারের অভাব ধীরে ধীরে কমতে থাকে। একসময় নুরবানু বেগম তার মেয়ে রাশিদাকেও কারচুপির কাজ শিখায়। পড়ালেখার পাশাপাশি রাশিদা তার মা কে কারচুপির কাজে সাহায্য করে। ১৬,০০০/- টাকা বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে নুরবানু পুঁতি ও সেট কাপড় ক্রয় করে বিভিন্ন নকশার কাপড় তৈরী করে বড় বাজারে বিক্রি করেন। প্রতি মাসে এখন গড়ে ৫,০০০/- টাকা আয় করেন। নুরবানুর পরিবারে এখন আর কোন অভাব অনটন নাই। নুরবানু বলেন, **'কারচুপির কাম শিইখ্যে আমার এ্যাখন ম্যালা উন্নতি হয়্যাছে। ভবিষ্যতে আমার নকশা করা কাপুড় আমি আমার লিজস্ব দুকানে বেইজব।'** নুরবানুর বর্তমানে ৬০,০০০/- টাকা ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধে কোনো সমস্যা হয় না। ভবিষ্যতে তিনি নিজস্ব একটি ফ্যাশন হাউজ দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

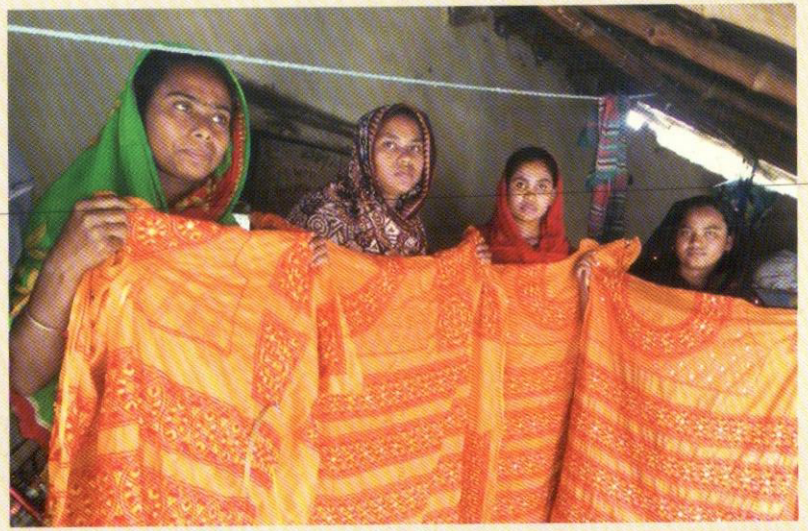

সবুজ সাথি রিনা বেগম, কেঁচো সার উৎপাদনে স্বাবলম্বী এখন

রিনা বেগম, স্বামী: মোঃ রওশন আলী, মনিরামপুর, যশোর

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: নারী প্রধান পরিবার
জমির পরিমাণ: ৪ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৬ জন
মাসিক আয়: ৬,৫০০/- টাকা

পূর্বাপর

রিনা বেগম মণিরামপুর উপজেলার টুনিয়াঘরা গ্রামের একজন বাসিন্দা। ছেলে মেয়েসহ ৬ জনের সংসার তাঁর। রিনা বেগম উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় কেঁচো সার উৎপাদনের ওপর বিগত ২৪-২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি তিনি ৫০০/- টাকা অনুদান হিসেবে পান। অনুদানের টাকায় তিনি কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে কেঁচো সার উৎপাদনের ওপর তাঁর সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। এ অবস্থায় একদিন মণিরামপুর উপজেলার একজন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাঁর কেঁচো সার তৈরীর কারখানা পরিদর্শন করেন। রিনার আগ্রহ ও অর্জন দেখে ঐ কর্মকর্তা রিনার উৎপাদিত সার ক্রয়ের আশ্বাস দিয়ে রিনাকে আরও উৎসাহিত করেন। বর্তমানে তিনি ২০ টি চাড়িতে কেঁচো সার উৎপাদন করছেন। এ পর্যন্ত রিনা বেগম প্রায় ১,৫০০ কেজি সার উৎপাদন করেছেন এবং বিক্রি করেছেন ত্রিশ হাজার টাকা। প্রতি কেজি সারের মূল্য স্থানীয় বাজার অনুযায়ী ২০/- টাকা। এছাড়াও তিনি নিজের জমিতেও এই সার ব্যবহার করে থাকেন। দিন দিন তার কেঁচো সার উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন আর আগের মত সংসারে তেমন অভাব অনটন নেই। ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া চালাতে তার কোন সমস্যা হচ্ছে না। রিনা বলেন, **'টাকা পয়সা ছিল না তাই সমাজের লোক আমাকে গুনতির ভিতর রাখতো না। কিন্তু এখন আমি সমাজে একজন সম্মানিত লোক।'** প্রায় প্রতিদিন কেঁচো সার উৎপাদন বিষয়ে পরামর্শ নেয়ার জন্য তার কাছে লোকজন আসে। এলাকার মানুষ কেঁচো সার উৎপাদন ও ব্যবহারের এই বিশেষ দক্ষতার কারণে তাকে খুব কদর করেন। শুধু তাই নয়, তার দেখাদেখি গ্রামে এখন অনেকেই কেঁচো সার উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

একজোড়া ছাগল আর স্বপ্ন ধারায়, সায়াহ্নে তার অভাব তাড়ায়

জুলেখা বেগম, স্বামী: মৃত আমীর হোসেন, ভেলুমিয়া, ভোলা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: বিধবা এবং উপকূলীয় নাজুক এলাকায় বসবাস
জমির পরিমাণ: ভূমিহীন
আয়ের উৎস: পরের বাড়িতে কাজ
পরিবারের আকার: ১ জন
মাসিক আয়: ৩,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:

মেঘনা নদীর কোলে জুলেখার জন্ম। ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয় জুলেখার। তাঁর ৬জন ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা সবাই যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর জুলেখাকে ভরণপোষণ দেয়ার কেউ ছিল না। তাঁর ভাষায়, **'রোজ মানষের বাড়তে কাম কইরা হ্যারা যে চাউল ডাইল দেতো হেইয়া দিয়া প্যাট চালাইতাম। এই রহম কতদিন যে গেছে কামে যাইতে পারি নাই বইল্লা ৩ বেলা খাওন খাইতে পারি নাই।'** তাঁর আর্থসামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে ১/৭/২০১৪ তারিখে অনুদান হিসাবে ২টি ব্লাকবেঙ্গল জাতের কালো ছাগল ও ছাগলের বাসস্থান হিসাবে ১টি মাচা দেয়া হয়। জুলেখাকে তাঁর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৮-১৯ মার্চ ২০১৫ মেয়াদে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। জুলেখা নিজ সন্তানদের মতো ছাগলগুলো পালন করতে থাকেন। ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর ছোট ছেলে তাঁকে তাদের বাড়িতে থাকার জন্য নিয়ে যায়। আর এই বয়সে এমন একটি অবলম্বন জুলেখার দরকার ছিল। জুলেখা এখন পর্যন্ত ৭৩,৫০০/- টাকার ছাগল বিক্রি করেছেন। ছাগল বিক্রির টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ৪০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তিনি ২টি গরু তাঁর ছেলেকে কিনে দিয়েছেন। তাঁর ছেলে কাঠমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি গরু পালন করেন। বর্তমানে জুলেখার ১৮টি ছাগল আছে। ৪০,০০০/- টাকা ঋণের কিস্তি জুলেখা নিজের আয় হতে পরিশোধ করেন। জীবন সায়াহ্নে এসে উজ্জীবিত প্রকল্পের উজ্জীবনী সুধায় তাঁর প্রৌঢ়তা যেন যৌবনের স্বাদ পেল।

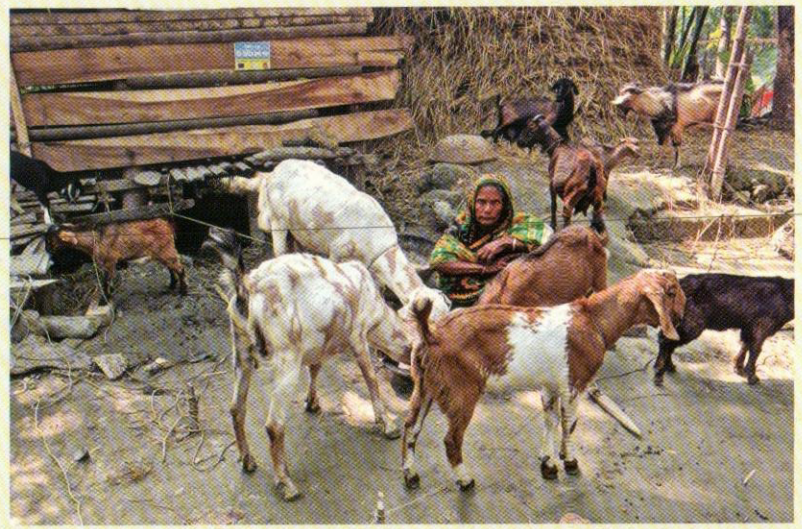

উজ্জীবিত কর্মসূচী
দর্জী মাষ্টার
নিপা আক্তার
মোবাইল নম্বর :- ০১৭৯৩৩৪৭৭৭৯
সমিতির নাম-পল্লীবন্ধু

সেলাই প্রশিক্ষণ, পাল্টে দেয় জীবন

নিপা আক্তার, স্বামী: মোঃ রহমত আলী, বোরহানউদ্দিন, ভোলা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক এলাকায় বসবাস
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: ভ্যান চালক
পরিবারের আকার: ৬ জন
মাসিক আয়: ৫,৫০০/- টাকা

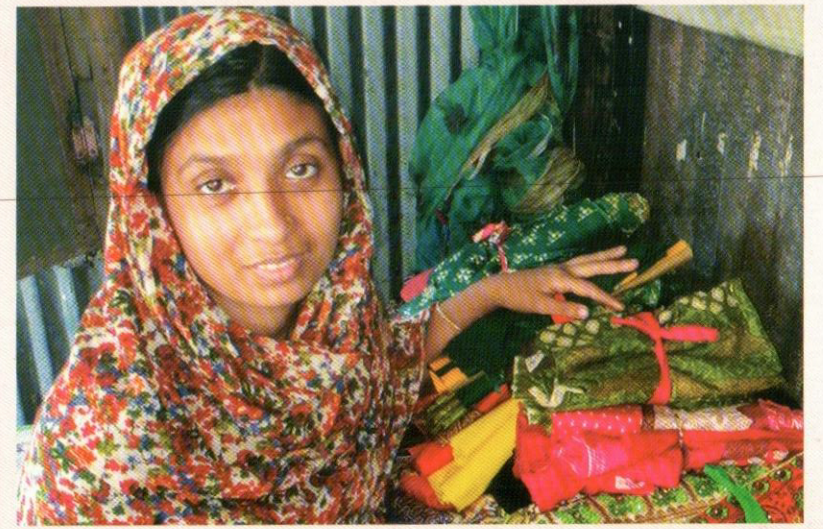

পূর্বাপর:
নিপা আক্তার ২০১৪ সালে উজ্জীবিত প্রকল্পে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। দুই সন্তান, স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়িসহ ৬ জনের সংসার নিপার। তাঁর স্বামী রহমত আলী একজন ভ্যান চালক। নিপার আগ্রহ এবং পারিবারিক অবস্থার কথা বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ২০১৫ সালে সেলাই এর ওপর ১ মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নিপা প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে প্রশিক্ষণে যেতেন। দারিদ্র্যতা জয়ের জন্য তাঁর ছিল দৃঢ় মনোবল। নিপা বলেন, **'এই সেলাই ট্রেনিংই আমাগো জীবনটা ঘুরাইয়া দিছে যে।'** কঠোর পরিশ্রম করে নিপা তাঁর সংসারের অভাব দূর করেছেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি প্রথম ১ মাস নাম মাত্র মূল্যে পাড়া প্রতিবেশীর জামাকাপড় সেলাই করতেন। পরবর্তীতে তাঁর কাজের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে গ্রামের মেয়েরা তাঁর কাছে সেলাইয়ের কাজ শিখতে আসে। নিপা জনপ্রতি ২,০০০/- টাকাতে নিজের বাসায় ২ মাসের সেলাই শিখার কোর্স চালু করেন। ২০১৭ এর জুলাই পর্যন্ত তিনি ২৪ জনকে সেলাইয়ের কাজ শিখিয়েছেন। নিপা তাঁর কাজের সুবিধার জন্য পুঁজি হতে আরো ২টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। নিপা বলেন, **'মানুষডা আগে অন্যের ভ্যান চালাইতো যে, আয় যা হইতো তার প্রায় সবঠায় মালিক পাইত। এহন আমি উনাকে অটোভ্যান গাড়ি কিইনা দিছি। লাভ যা হয় আমাগোরই থায়।'** নিপার বাড়িতে রংবেরঙের থান কাপড় আছে। এগুলো তিনি ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করেন। নিপা বর্তমানে কোন অসুবিধা ছাড়া ১,১০,০০০/- টাকা ঋণের কিস্তি চালান। ভবিষ্যতের জন্য মাসিক ১,০০০/- টাকা করে সঞ্চয়ও করেন তিনি। ভবিষ্যতে শহরে একটি ফ্যাশন হাউজ দেওয়ার শখ আছে ভোলার এই প্রত্যন্ত গ্রামের বধুর।

বারমাস হয় দুঃখ দূরীভূত, কবুতর খামার করে উজ্জীবিত

সোমা বেগম, স্বামী: রেজাউল ইসলাম, চিনাটোলা, যশোর

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: নারী প্রধান
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:

অতিদরিদ্র সোমা দিনমজুরী আর পরের বাড়ি কাজ করে সংসারটা কোনভাবে জোড়াতালি দিয়ে চালাতেন। সোমার স্বামী কোন আয় রোজগার করতেন না। স্বল্প পরিসরে মাত্র ৬ জোড়া কবুতন পালন করতেন তারা। কবুতরের বাচ্চা বিক্রির টাকায় সংসারের টুকটাকি খরচ হতো। কিন্তু ২ বেলা খাবারের নিশ্চিয়তা প্রতিদিন ছিল না। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য হিসেবে সোমা বেগম প্রকল্প হতে দক্ষতা উন্নয়নমূল প্রশিক্ষণের আওতায় ২০১৫ সালে কবুতর পালনের ওপর ২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সোমার স্বামীও এই খামারে আংশিক সময় দেয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর খামারে ৯০ জোড়া বিভিন্ন জাতের কবুতর রয়েছে। যেমন বুনো, গিরিবাজ, সিরাজী ইত্যাদি। এই খামার থেকে বর্তমানে তার প্রতিমাসে গড়ে ৪৫ থেকে ৫০ জোড়া কবুতর বাচ্চা দিচ্ছে। আর প্রতি সেট কবুতরের বাচ্চার বাজার মূল্য ১২০/- টাকা। অর্থাৎ প্রতিমাসে শুধুমাত্র কবুতর পালন থেকে তার আয় হয় ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। সোমা বেগমের সংসারের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তনের পাশাপাশি পেশারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সোমাকে দিনমজুরী আর পরের বাড়ি কাজ করতে যেতে হয় না। সোমা বলেন, **'কবুতার পালনে আমাগে বাড়তি সময় দিতে হয়না। সংসারে বিভিন্ন কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি এ খামার দেহাশোনা করি। আমার স্বামী বিভিন্ন বাজারে জায়ে কবুতারের বাচ্ছা বেচে, আবার অনেক সময় বিভিন্ন জায়গার থেকে লোকজন আমাগে বাড়ি আসে কবুতারের বাচ্ছা কেনার জন্য। আমার স্বামী তাদের সাথে কথা কইয়ে কবুতারে বাচ্ছা বেচে দেয়।'** সোমা বেগমের কবুতর ফার্মের এই সাফল্য দেখে স্থানীয় অনেকেই ছোট-বড় আকারে কবুতরের খামার করেছেন।

খাদিজা বেগম: মাটি কাটার দিন শেষ, ছাগল পালনে সুদিনের উন্মেষ

মোসাম্মাৎ খাদিজা বেগম, স্বামীঃ মো: মোশারেপ হোসেন, বরগুনা সদর, বরগুনা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করে সংসার চলে
জমির পরিমাণ: ভূমিহীন
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৪ জন
মাসিক আয়: ৩,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:
বরগুনা সদর উপজেলার লাকুরতলা গ্রামের মোসাম্মাৎ খাদিজা বেগম গৌরিচন্না ইউনিয়নের একজন আরইআরএমপি-২ সদস্য। মাত্র ১৯ বছর বয়সে বেকার মোশারেপের সাথে তার বিয়ে হয়। কিছুদিনেই তাদের টানপোড়নের সংসারে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। সংসার যখন আর চলছিলো না তখন স্বামী ট্রাকে বালি ভরার দিনমজুরের কাজ নেয়। এ কাজ বছরের প্রায় ছয় মাস বন্ধ থাকে। অভাব আর দেনাগ্রস্থ মোশারেপ একসময় খাদিজাকে ফেলে পালিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে খাদিজা গৌরিচন্না ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আরইআরএমপি-২ সদস্য হিসেবে ২০১৫ সালের প্রথম ব্যাচে মাটি কাটার কাজ শুরু করে। পাশাপাশি উজ্জীবিত প্রকল্প হতে খাদিজা মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ডিসেম্বর ২০১৬ সালে আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়। ঘটনাচক্রে স্বামী মোশারেপ আবার তার কাছে চলে আসে। দুই বছরে মাটি কাটার কাজ শেষে খাদিজা তাঁর জমাকৃত সঞ্চয়ের মোট ৩৬,০০০/- টাকা এককালীন পান। কিছু টাকা দিয়ে তিনি তার নড়বড়ে ঘরটি মেরামত করেন। আর কিছু টাকা দেনা পরিশোধ করার পর ছাগল পালনের উদ্দেশ্যে দুটি মা ছাগল ক্রয় করে লালন-পালন শুরু করে। ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে আরইআরএমপি-২ সদস্য হিসেবে ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ওপর ১০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ঐ টাকায় খাদিজা আরো ০২টি কালো জাতের মা ছাগল ক্রয় করেন এবং ছাগল পালনের জন্য একটি বড় ঘর তৈরি করেন। বর্তমানে খাদিজার ৮টি ছাগল। যার বর্তমান মূল্য ৫৬,০০০/- টাকা। খাদিজা বলেন, **'উজ্জীবিত প্রকল্পের পিক্কেই মোর এই উন্নতি অইছে। আরাইয়া যাওয়া সোংসার এ্যাহোন আবার ফির্‌রা পাইছি মুই।'** তার এই অগ্রগতি আশপাশের নারীদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে।

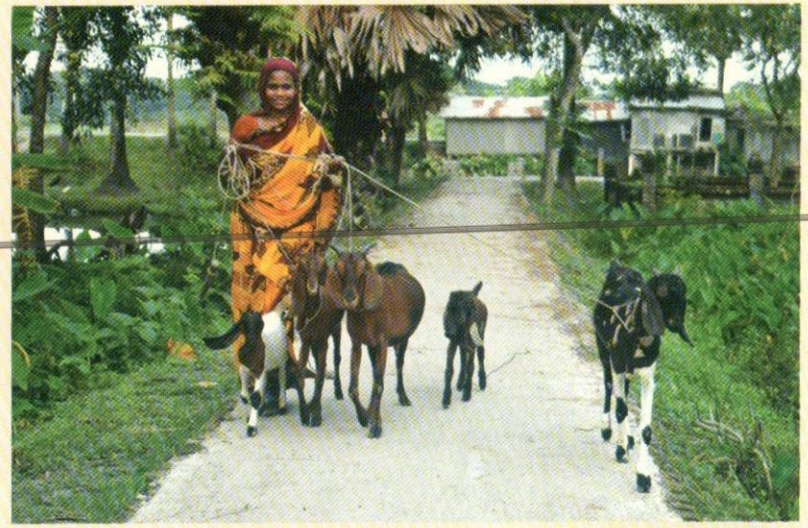

The European Union's Food Security Programme for
ইউপিপি-উজ্জীবিত কম্পোনেন্টের
আওতায় আরইআরএমপি-২ সদস্যদের
মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন প্রদর্শনী
সদস্যের নাম : পার্বতী রানী
ঠিকানা : নাচনাপাড়া, টিয়াখালী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
শাখার নাম : কলাপাড়া শাখা

স্বকর্মে পার্বতী, দৃষ্টান্তমূলক উন্নতি

পার্বতী রানী, স্বামীঃ শংকর দাশ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী

প্রাক্ জীবনচিত্রঃ
অতি দারিদ্র্যতার ধরনঃ উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাস
জমির পরিমাণঃ ভূমিহীন
আয়ের উৎসঃ দিন মজুর
পরিবারের আকারঃ ৫ জন
মাসিক আয়ঃ ৩,০০০/- টাকা

পূর্বাপরঃ

পার্বতী রানী সংসারে এক সময় অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তিন বেলার মধ্যে কোনোদিন দুই বেলা, কোনোদিন এক বেলা এমনকি কোনোদিন না খেয়ে থাকতে হতো পার্বতী রানীর পরিবারকে। ১৩ বছর আগে তার সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। দিনমজুর স্বামীর রোজগারের টাকায় সংসার চলতো না। তিনি পাশের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ নেন। কিন্তু তাতেও তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তার সংসার চলছিল না। অবশেষে ২০১৪ সালে পার্বতী উজ্জীবিত প্রকল্পের আরইআরএমপি-২ কম্পোনেন্টের সদস্য হয়ে মাটি কাটার কাজ শুরু করেন। প্রতিদিন একশত টাকা হিসেবে তিনি মাসে তিন হাজার টাকা পেতেন। বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকে প্রতিদিন ৫০/- টাকা হিসেবে মাসে ১,৫০০/- টাকা হিসাবে জমা হয় পার্বতীর। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে ২০১৪ সালে দুদিন ব্যাপি মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন পার্বতী রানী। প্রশিক্ষণ পরবর্তী পার্বতী রানী একটি ছাগলের বাচ্চাকে বর্গা হিসেবে পালন করেন। ৫ মাসের মাথায় ওই ছাগল দুটি বাচ্চা জন্ম দেয় যার একটি তিনি ভাগে পান। এভাবে ধীরে ধীরে তার ভাগে ছাগলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে আরইআরএমপি-২ প্রকল্পের দুবছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তার সঞ্চিত ৩৬ হাজার টাকা পান। এর থেকে ১১ হাজার টাকায় তিনটি ছাগল কেনেন তিনি। নিজের কেনা তিনটি ও ভাগে পাওয়া ছাগলগুলো যত্নের সঙ্গে পালন করতে থাকেন পার্বতী রানী। পার্বতী বলেন, **'হ্যারপর হইতে আর মোর পিছন ফিরা তাকাইতে অয় নাই।'** বর্তমানে তার ১৪টি ছাগল রয়েছে। ৪ মাস আগে ৪টি ছাগল বিক্রি করে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে মেয়ের বিয়ে দেন। এক ছেলে, এক মেয়ে আর স্বামী নিয়ে পার্বতী রানী সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

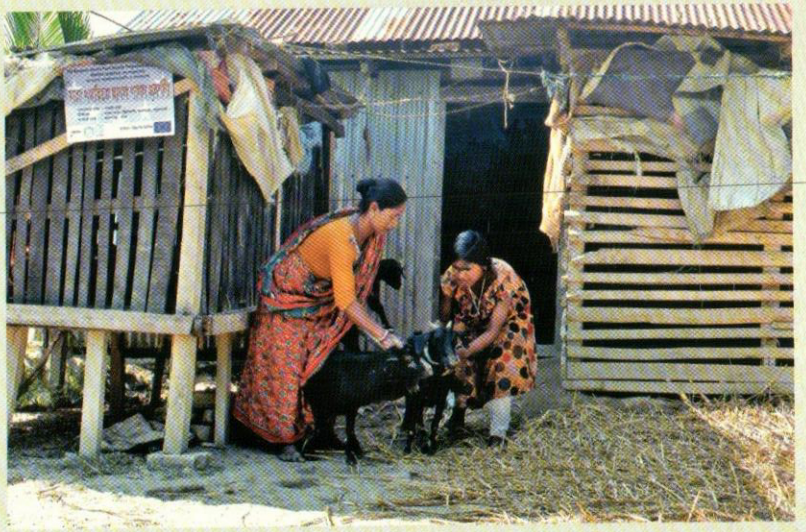

বাঁশ বেতে স্বপ্ন বুনন, সহায়ক তাঁর প্রশিক্ষণ

ভারতী দাস, স্বামী: সন্তোষ দাস, পাইকগাছা, খুলনা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: নারী প্রধান পরিবার
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৫,৫০০/- টাকা

পূর্বাপর:
ভারতী দাস অতিদরিদ্র পরিবার হিসেবে উজ্জীবিত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন ২০১৪ সালে। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারটির একমাত্র উপার্জনক্ষম হলেন তাঁর স্বামী সন্তোষ দাস। তিনি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন করেন তা দিয়ে অতি কষ্টে ৫ (পাঁচ) সদস্যের পরিবারটির ভরণ পোষণ চলে। এই আয়ে নিজেদের খাবারের সংস্থান করাই খুব কষ্টকর ছিল। তাই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত খরচ করার সুযোগ ছিল না। পারিবারিক দৈন্যতা ও আগ্রহের কথা বিবেচনা করে ভারতীকে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় 'হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণ' (বাঁশ ও বেতের সামগ্রী প্রস্তুত) এর ওপর ১৪-২৯ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১২ (বার) দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিজ বাড়িতে বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির পাশাপাশি দেশি মুরগিও পালন করেন ভারতী। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভারতী আয় রোজগার করাতে তাদের সংসারে এখন আর অভাব নেই। বাঁশবেতের কাজ হাঁসমুরগি পালন আর ঘর সংসারের কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এখন ভারতীর নিত্যদিন। ভারতী প্রত্যহ স্বপ্ন দেখেন বাঁশ ও বেতের ফলার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে যাবে তাঁর জীবনের সাথে লতার মতো জড়িয়ে থাকা দারিদ্র্যতা। ভারতী বলেন, **'এই টাইমির মধ্যি মাইয়ে দুডোর বিয়ে দিছি। তাছাড়া ও বাড়তি আয়ের টাকা দিয়ে আমি একটি গাই গরু কিনিছি। এহনে আমার সংসারে সবাই আগের থেকেও ভালোভাবে জীবন যাপন কত্তিছি।'** ভারতীর বাড়ি থেকে যখন ফিরছিলাম মনের অজান্তেই বেতের ফলার ফাঁক ছিড়ে শিশুদের হাসি আর ভারতীর স্বপ্নরেখা উঁকি দিয়ে যায় মনের জানালায়। ফেরার সময় ভারতী বলছিলেন, **'আপনারা আবার আইলে অনেক খুশি হবোনে'**।

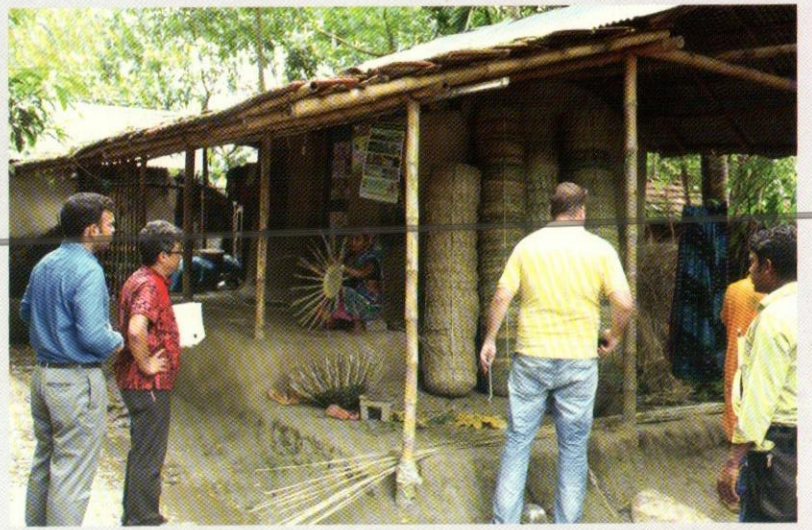

ছাগল পালন প্রদর্শনী
উজ্জীবিত প্রকল্প

কালো মানিকে অভাব মোচন, আয়েশা সবার অনুকরণ

আয়েশা বেগম, স্বামী: আবদুস সাত্তার, নলটোনা, বরগুনা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপকূলীয় নাজুক অঞ্চলে বসবাস
জমির পরিমাণ: ভূমিহীন
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:

বরগুনা সদর উপজেলার কুমিরমারা গ্রামের আয়শা বেগম ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের একজন সদস্য। তার স্বামীর পেশায় দিনমজুর। তিনি বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বেড়িবাঁধের বাইরে সরকারিভাবে পাওয়া খাস জমিতে বসবাস করেন। তার ছেলে ট্রলারের শ্রমিক ছিল। সে সাগরে মাছ ধরার সময় মারা গেলে সংসারটি খুবই অসহায় অবস্থায় পড়ে যায়। এই প্রকল্পের একজন অতিদরিদ্র্য সদস্য হিসেবে ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে আয়েশা ছাগল পালনের ওপর প্রশিক্ষণ পান। পরবর্তীতে আয়েশা বেগমকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের জন্য অনুদান হিসেবে ২ টি মা ছাগল, একটি ছাগলের ঘর ও ঘাস লাগানোর জন্য সর্বোমোট ৮,০০০/- টাকা দেয়া হয়। তাঁর নিজের ২টি ছাগীসহ মোট ৪টি ছাগলের একটি খামার তৈরি করে আয়শা। আয়েশার ঘরের পাশেই ছাগলের চারণভূমি। সেখানে তাঁর মেয়েরা নিয়মিত ছাগলকে চড়াতে নিয়ে যায়। এক বছরে তাঁর ছাগলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১২ টিতে। দ্বিতীয় বছর ৩০ টি ছাগলের এক বড় খামার তৈরি হয়। দুর্ঘটনাবশত ১টি ছাগল মেছো বিড়াল মেরে ফেললে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কিছু ছাগল বিক্রি করে দিয়ে একটি গাভী কিনবেন। তাই ১০ টি ছাগল বিক্রি করে ১টি দুধেল গাভী ক্রয় করেন। ২০১৭ সনে তিনি আরো ৯টি ছাগল ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে নতুন ঘর তুলেছেন। বর্তমানে তাঁর ১০টি ছাগল ও ১টি গাভী আছে। দারিদ্র্যতা জয় করে আয়শা এখন স্বাবলম্বী নারী। আয়েশা বলেন, **'আমনহেগো সহযোগিতা আর সেবায় মুই এ্যাহোন স্বাবলম্বী। জীবনেও ভাবি নাই মোর একটা খামার অইবে, এ্যাকটা সুন্দর বাড়ি অইবে! মুই যে আল্লার ধারে কতডা কৃতজ্ঞ হ্যা ভাষায় ক্যামনে কমু মুই জানিনা। আমনহেগো সেবার উছিলায় আল্লায় মোরে সমাজে মান সম্মান দেছে।'**

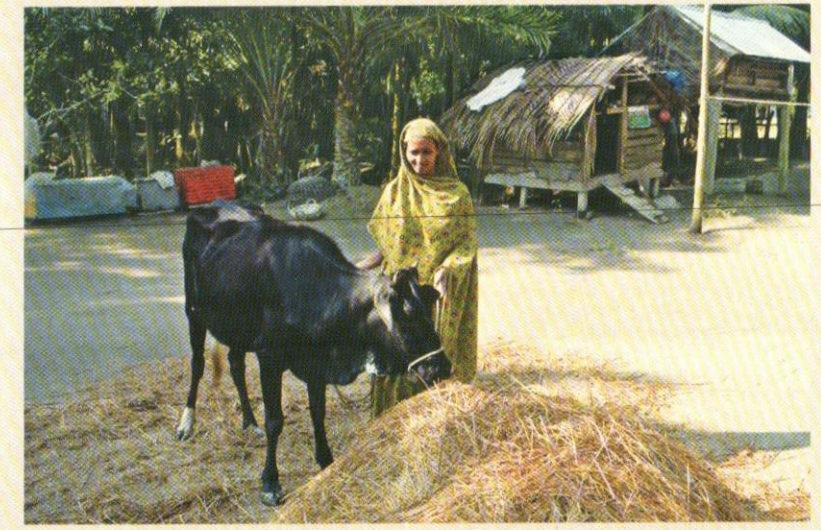

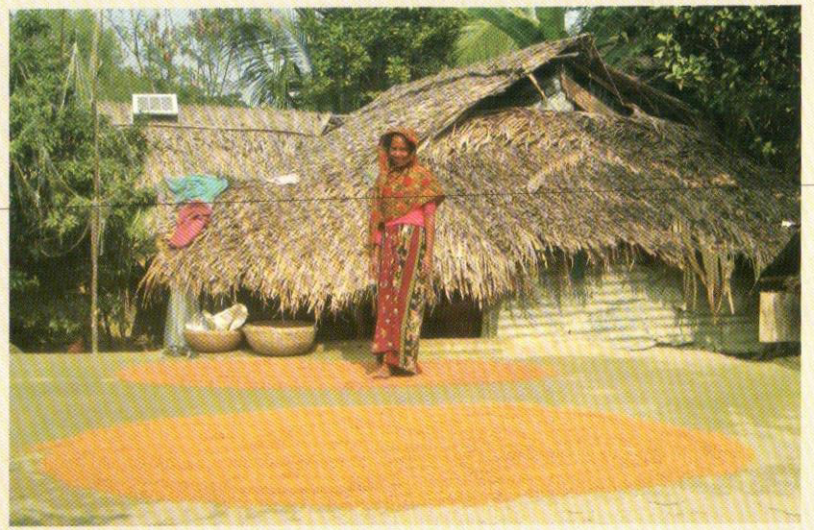

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পরিবারে উজ্জীবিত হাওয়া, মালতী রাণীর বদলে যাওয়া

মালতী রাণী, স্বামী: শ্রীফল দাশ, পবা, রাজশাহী

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: উপজাতী নারী প্রধান পরিবার
জমির পরিমাণ: ভূমিহীন
আয়ের উৎস: দিন মজুর
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৫,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:
মালতী রাণী সাঁওতাল পরিবারের উজ্জীবিত প্রকল্পের একজন সদস্য। পরের জমিতে দিনমজুরীর কাজ করে মালতী যা আয় হয় তা দিয়েই সংসার চলে। যেদিন কাজে যেতে পারেন না সেদিন মালতীর কপালে জুটতো সীমাহীন অত্যাচার। তাঁর স্বামীকে মদ খাওয়ার টাকা যোগাড় না করে দিলে অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যেতো। মালতী বলেন, **'আরেক জনের কাছ থ্যাকি ট্যাকা লিয়া মেলা লজ্জার জিনিস। এ্যার ল্যাগি যেখেন সেখেন মেলা ছুট্ খাটো কথা শুইনতে হ। আবার আমারির ছ্যালি প্যালিরে কোও মেলা গিলি কথা শুইনতে হ। আমি মিয়া ছ্যালি এগলি ছুট্ বড় কথা শুইনলে আমাক হেবি সরম লাইগতো।'** এমন নাজুক অবস্থায় তাঁকে প্রকল্প হতে ২টি ভেড়ী, ৫টি ডেকি মুরগী এবং বাড়ির পাশে পতিত ৫ শতক জায়গায় মৌসুমি সবজি চাষের জন্য কয়েক রকমের বীজ দেয়া হয়। প্রোগ্রাম অফিসার সোশ্যাল শ্রীফল দাশকে শারীরিক সুস্থতাসহ নৈতিকতার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। এভাবে মাসখানিক পর মালতী প্রকল্পের নির্দেশনা মতো কাজ করে তাঁর সবজির বাগান, মুরগী আর ভেড়া হতে আর্থিকভাবে সুফল পাওয়া শুরু করলেন। মালতী তাঁর বড় দুই সন্তান নিলয় আর পরাগকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। মাঝখানে ২টি ভেড়ার বাচ্চা বিক্রি করে প্রতিবেশীদের দায়দেনা পরিশোধ করলেন। কালক্রমে শ্রীফল দাশও সংসারে মনোযোগী হয়ে উঠেন। মালতীকে আর দিনমজুরীর কাজ করতে হয় না। শ্রীফল দাশ তার স্ত্রীকে সবজির বাগান আর ভেড়ী লালনপালনে সহায়তা করতে শুরু করেন। মালতী বলেন, **'এ ধরেন যে দু/ তিন মাস পর পর সবজি টবজি বেচি টেচি ১০ থ্যাকি ১২ হাজারের মুতন ট্যাকা লাব হ অমি ইট্টুক জমি কটে লিছি। আমি বাড়ির গিলিনে আবাদ টাবাদ করি আর আমারির নিলয়ের বাপ কট লিয়া ভুইডাত আবাদ টাবাদ করে। আমারির ছ্যালি প্যালিক আর আমারির মুতন এরকুম কষ্ট টষ্ট কত্তে হোবে না।'**

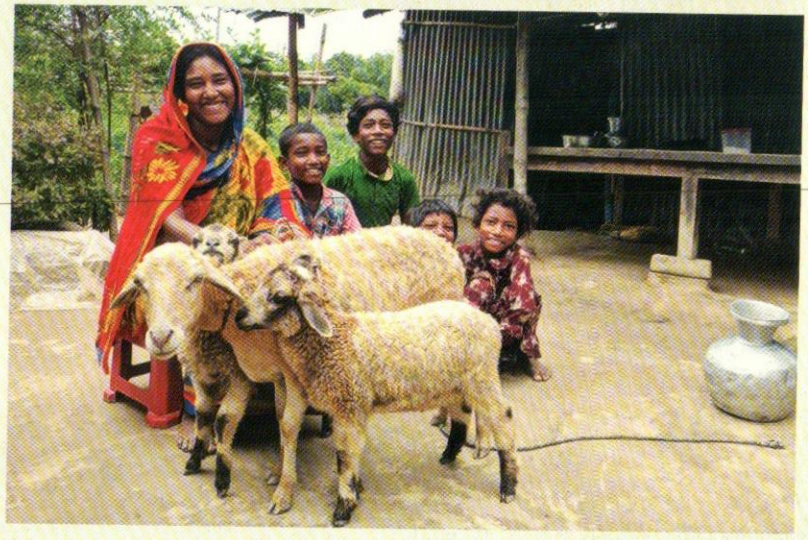

অনুদান ভিত্তিক আই জি এ
ক্ষুদ্র ব্যবসা
সদস্যার নামঃ-হাসনা বেগম, কোড-৮৪.
বাস্তবায়নেঃ-এফ ডিএ উজ্জীবিত প্রকল্প
অর্থায়নেঃ-FDA FDA PKSF PKSF EU
SUPERMAN

প্রতিবন্ধী পরিবার, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সুখ অপার

হাসনা বেগম, স্বামী: তছির আহাম্মেদ, দুলারহাট, ভোলা

প্রাক্ জীবনচিত্র:
অতি দারিদ্র্যতার ধরন: প্রতিবন্ধী পরিবার
জমির পরিমাণ: ৩ শতাংশ
আয়ের উৎস: ক্ষুদ্র ব্যবসা
পরিবারের আকার: ৫ জন
মাসিক আয়: ৬,০০০/- টাকা

পূর্বাপর:

বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ ভোলা জেলার নদী ভাংগন কবলিত ও ঝড়ঝঞ্জাবেষ্টিত উপজেলা চরফ্যাশন। নীলকমল ইউনিয়ন চরফ্যাশন উপজেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। নীলকমলের চর নুরুল আমিন গ্রামের বাসিন্দা প্রতিবন্ধি তছির আহাম্মেদ। প্রতিবন্ধী তছিরের স্ত্রী হাসনা বেগম একজন বাক প্রতিবন্ধী। ঋণের টাকায় ২০১১ সালে বাড়ির সামনে চা, পান ও বিস্কুটের দোকান দেন তছির আহাম্মেদ। পুঁজির অভাবে দোকানে পর্যাপ্ত মালমাল না থাকায় বেচাকেনা ভালো হতো না। সময়মতো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় অনেক অপমান সহ্য করতে হতো হাসনা বেগমকে। একসময় সমিতির সদস্যপদ বাতিল করা হয় হাসনা বেগমের। উজ্জীবিত প্রকল্পে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সহযোগীতার সুবাদে হাসনার পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ৮,০০০/- টাকা অনুদান পায়। হাসনা হেনা আরো ৭,০০০/- টাকা বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে তাঁর দোকানে পর্যাপ্ত বিস্কুট সামগ্রী ও কিছু মুদী মালামাল তোলেন। প্রতিবন্ধী পরিবার হিসাবে এলাকাবাসী তাঁর দোকান হতে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের সুবাদে দোকানের বেচাকেনা বৃদ্ধি পায়। তছির বলেন, **'আল্লায় ভালা রাখছে আমাগোরে; আপনাগো টাকা ও বুদ্ধি পাইয়া আমাগো সংসারে উন্নতি হইছে।'** তসির ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি মোবাইল ও ইলেকট্রিকের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজও করেন। এতে মাসে অতিরিক্ত কিছু টাকা আয় হয়। কিস্তি পরিশোধের ভয়ে যে তছিরের পরিবারের সদস্য পদ বাতিল হয়েছিল সেই তসির বলেন, **'এহন আমার দোয়ানের কামাই দিয়া ৩৯,০০০/- টাকা লোনের কিস্তি চালাই। হিরয়া আমি ৫০,০০০/- টাকা লোন লইয়া ব্যবসাডারে আরো বড় করমু।'**

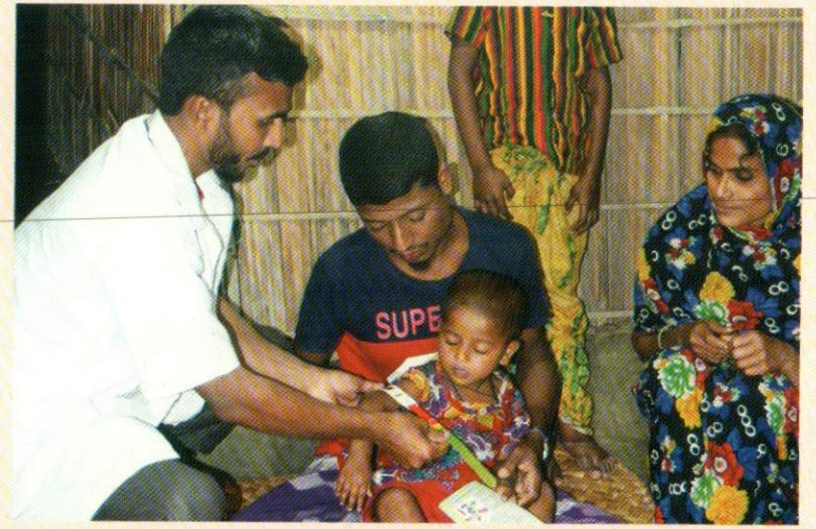

রিজিয়াঃ একটি সূর্যোদয়ের গল্প

হোসনে আরা বেগম, স্বামীঃ নূরুল ইসলাম, শশীভূষন, চরফ্যাশন

প্রাক্ জীবনচিত্রঃ
অতি দারিদ্র্যতার ধরনঃ উপকূলীয় নাজুক এলাকায় বসবাস
জমির পরিমাণঃ ৪ শতাংশ
আয়ের উৎসঃ মসজিদে ইমামতি
পরিবারের আকারঃ ৫ জন
মাসিক আয়ঃ ৫,০০০/- টাকা

পূর্বাপরঃ
রিজিয়া, একজন বাকপ্রতিবন্ধী মেয়ে। তার বাবা স্থানীয় মসজিদের একজন ইমাম। তার মা, হোসনে আরা বেগম উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য। পারিবারিক দৈন্যতা ও আগ্রহের কথা বিবেচনা করে রিজিয়াকে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে ২০১৭ সালে ৩০ দিনব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পূর্বের সময়টা রিজিয়ার অলসভাবে কাটতো। কথা বলতে আর কানে শুনতে পারে না বলে তার সাথে পরিবারের সদস্য ছাড়াও অন্যান্যরা কথা বলতে বা মিশতে চাইতো না। সে প্রশিক্ষণে প্রতিদিন আসা-যাওয়ার সুবাদে প্রতিবেশীরা তার কাজ সম্পর্কে জানতে পারে। ভালোভাবে সেলাইয়ের কাজ শিখে রিজিয়া প্রতিবেশীদের বিভিন্ন সেলাইয়ের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতে শুরু করে। শুরু হয় তার ব্যস্ত জীবন। কাজের সাথে সাথে আয় আর পরিচিতিও বাড়ে রিজিয়ার। পরিবারে তার গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যায়। তার বাবা বলছিলেন, **'আমার মাইয়্যা হের ট্যাহায় গরু আমারে গরু কিন্যান্না দিছে, কি আনন্দ বুজছেননি যে স্যার।'** দিনান্ত কাজে ব্যস্ত রিজিয়াকে নিয়ে তাঁর বাবা মা এখন গর্ব করে লক্ষী মেয়ে বলে ডাকেন। রিজিয়া সেলাইয়ের কাজ শিখার পর তাঁর আয় দিয়ে ১২ বছরের জন্য মাসিক ১,০০০/ টাকা হিসাবে সঞ্চয় হিসাব খুলেছেন তাঁর মা। সুখে আছেন রিজিয়া আর শান্তিতে রেখেছেন তাঁর পরিবারকে। রিজিয়া তাঁর কাজ দিয়ে প্রমাণ করেছেন উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে সমাজে তারাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

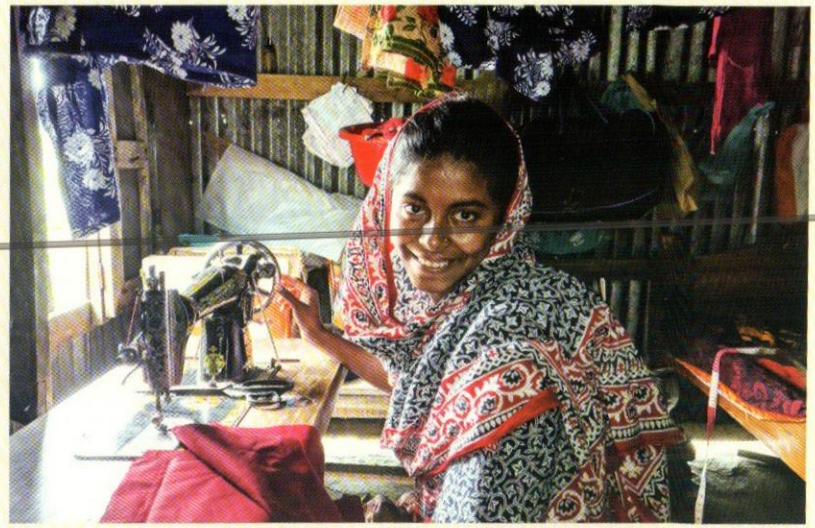

চিরকুট

'জীবনের ৩৬ বছর পর আপনাগো উছিলায় (উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে) আবার মা-বাবার কাছে আইছি। অহন তো আমি প্রতি মাসে গড়ে ৮ হাজার টাকা আয় করবার পারি। বাবা কিছু কয়না। মা খালি কয় মানুষজন তোর লাগি আবার কথা কওয়া শুর করছে। স্যার জানিনা কয় দিন এভাবে থাকবার পারব। মনডাও কেন জানি কালি (শুধু) ওদের সাথে যাইবার চাই। দোয়া রাইক্যান যেন থাকবার পারি'

শৈশবকাল

শৈশবে মা-বাবা নাম রেখেছিল সোবহান আলী। আলীশান ইচ্ছে থাকলেও দারিদ্র্যতার যাঁতাকলে চেপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার গহীনের সব ইচ্ছেগুলো। পরিচিত উঠোন, মায়ের আঁচল আর পাড়ার দশটা দুষ্ট ছেলেদের সাথে বেলা-অবেলায় নিত্য খেলাধুলায় মগ্ন থাকা দিনলিপি বেশি দিন সইলো না সোবহান আলীর। মাত্র ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা পর সোবহান আলীর পড়াশুনায় মন ঠেকে না। একদিকে দারিদ্র্যতা অন্য দিকে নিজের সাথে একান্তে নিজের বোঝাপড়ার অমিল। সোবহান আলীর এই অন্তদ্বন্দ্বে দিন যায়, মাস যায়।

দহনকাল

মাস গড়িয়ে ক্যান্ডোরের পাতায় বছর ঘুরে; সাথে সোবআন আলী ভেতরের সত্ত্বা ঘুরে যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পুরুষ অবয়ব থাকলেও গহীনে অন্য এক মানষী সে আজ। অবশেষে নিজের কাছে নিজের পরিবর্তনের পূর্ণ রূপ অনুধাবন। প্রথমে কানাঘুষা, জানাজানি অতপর কেবলই তিরষ্কার, গৃহ ছাড়ার দহন! মা-বাবা, পরিবার-প্রতিবেশীর কাছে কেবলই অবজ্ঞা আর অবহেলার ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ অহর্নিশ বুকের কিনারে লাগে! সবশেষে আপন ঠিকানার খোঁজে। 'ঘর থেইকা ১৬ বছর বয়সে পতম বের হইছিলাম। হিজড়াগো লগে চলে আইছি। তারপর হইতে আজ ২০ বছর পর্যন্ত গুরু মা'র কাছে আছি'। কথাগুলো বলছিলেন সোবহান আলী হতে ছাবিনা নামধারী এক দ্বৈত সত্ত্বা মানুষ। যাকে আমরা বলি হিজড়া, রাষ্ট্রীয় নাম তৃতীয় লিঙ্গ। কেউবা মানবিক দৃষ্টিতে তাদের ডাকে রূপান্তরকামি হিসেবে।

পরিবর্তন

ছাবিনার বর্তমান বয়স ৩৬ বছর। নিজ বাড়ি বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলাধীন চিকাছি ইউনিয়নের ঝিনায় গ্রামে। মায়ের নাম মোছাঃ রহিমা বেগম এবং বাবার নাম মোঃ রহিম। ৮ মাস পূর্বে তিনি টিএমএসএস হতে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বর্তমানে তিনি মাসে গড়ে আট হাজার টাকার মতো আয় করেন। তাঁর এই পরিবর্তিত জীবন নিয়ে খুশী হলেও পারিপার্শ্বিক কারণে সে এখনও শংকিত।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

পিকেএসএফ ভবন:ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ

টেলিফোন নং ৮৮০-২-৮১৮১৬৫৮-৬১ ফ্যাক্স নং ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮

ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org

ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org

ফেসবুক: www.facebook.com/PKSF.org